উপন্যাস

মৃত্যুক্ষুধা

কাজী নজরুল ইসলাম

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

মৃত্যুক্ষুধা - ০১ 3
মৃত্যুক্ষুধা - ০২ 10
মৃত্যুক্ষুধা - ০৩ 15
মৃত্যুক্ষুধা - ০৪ 21
মৃত্যুক্ষুধা - ০৫ 27
মৃত্যুক্ষুধা - ০৬ 30
মৃত্যুক্ষুধা - ০৭ 34
মৃত্যুক্ষুধা - ০৮ 40
মৃত্যুক্ষুধা - ০৯ 44
মৃত্যুক্ষুধা - ১০ 49
মৃত্যুক্ষুধা - ১১ 54
মৃত্যুক্ষুধা - ১২ 63
মৃত্যুক্ষুধা - ১৩ 67
মৃত্যুক্ষুধা - ১৪ 72
মৃত্যুক্ষুধা - ১৫ 75
মৃত্যুক্ষুধা - ১৬ 80
মৃত্যুক্ষুধা - ১৭ 84
মৃত্যুক্ষুধা - ১৮ 87
মৃত্যুক্ষুধা - ১৯ 94
মৃত্যুক্ষুধা - ২০ 107
মৃত্যুক্ষুধা - ২১ 111

মৃত্যুক্ষুধা - ২২ 117
মৃত্যুক্ষুধা - ২৩ 121
মৃত্যুক্ষুধা - ২৪ 130
মৃত্যুক্ষুধা - ২৫ 137
মৃত্যুক্ষুধা - ২৬ 141
মৃত্যুক্ষুধা - ২৭ 146
মৃত্যুক্ষুধা - ২৮ 155

মৃত্যুক্ষুধা - ০১

পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোন খেয়ালি খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।

খোকার চলে-যাওয়া পথের পানে জননির মতো চেয়ে আছে - খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মতো করে গাছ-পালার আড়াল টেনে রাখা।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মুসলমান আর 'ওমান কাত্‌লি' (রোমান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশি কনভার্ট ক্রিশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর আছে - চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মতো। তবে তাদেরও আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রিশ্চান - কারুর চাইতে কম নয়।

একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে - এরাও যেন তেমনই । পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করার মতো উৎসাহ বা অবসর নেই বেচারাদের জীবনে।

জাতিধর্মনির্বিশেষে এদের পুরুষেরা জনমজুর খাটে - অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ওই রকমের কোনো-একটা-কিছু করে। আর, মেয়েরা ধান বাড়িতে ভানে, ঘর-গেরস্তালির কাজকর্ম করে, রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করবার চেষ্টা করে।

বিধাতা যেন দয়া করেই এদের জীবনে দুঃখকে বড়ো করে দেখবার অবকাশ দেননি। তাহলে হয়তো মস্ত বড়ো একটা অঘটন ঘটত।

এরা যেন মৃত্যুর মাল-গুদাম! অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্লাই! আমদানি হতে যতক্ষণ, রপ্তানি হতেও ততক্ষণ!

মাথার ওপরে তেড়ির মতো এদের মাঝে দু-চারজন 'ভদ্দর-নুক'ও আছেন। কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি। ওইটেই যেন ওদের দুঃখকে বেশি উপহাস করে।

বিধাতার দেওয়া ছেলেমেয়ে এরা বিধাতার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিত মনে পান্তা-ভাত খেয়ে মজুরিতে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে এসে বড়ো ছেলেটাকে বেশ করে দু-ঘা ঠেঙায়, মেজেটাকে সম্বন্ধের বাচবিচার না রেখে গালি দেয়, সেজোটাকে দেয় লজঞ্চুস, ছোটোটাকে খায় চুমো, তারপর ভাত খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে – রোদে-পোড়া, ধূলিমলিন, ক্ষুধার্ত, গায়ে জামা নেই। অকারণ ঘুরে বেড়ায়, কাঠ কুড়োয়, সুতোকাটা ঘুড়ির পেছনে ছোটে এবং সেই সঙ্গে খাঁটি বাংলা ভাষার চর্চা করে।

এরাই থাকে চাঁদসড়কের চাঁদবাজার আলো করে।... এই চাঁদসড়কেরই একটা কলতলায় জল-নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুমখাত্তর ঝগড়া বেধে গেল।

কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়তো একদিন এক জাতিই ছিল – কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রিশ্চান। আর এক কালে এক জাতি ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম-বয়সি এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ওই মেয়ে দুটি করেনি। করছে তারা – যারা এই অনাছিষ্টি দেখছে।

গজালের মা-র পাড়াতে কুঁদুলি বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই ‘অপোজিশন লিড’করছে মুসলমান-তরফ থেকে।

অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা-র মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না! –একেবারে সেকালের ভীম-কান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতোই!

গজালের মা গজালের মতোই সরু – হাড্ডি-চামড়া,সার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা-র কটূক্তির জ্বালা তেমনই কিছুতেই আর মিটতে চায় না।

ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে, “হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?”

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুংকার দিয়ে উঠল, “তা বলবি বইকী লা সুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কিনা!’ ”

গজালের মা রাগের চোটে তার ভরা কলসির সব জলটা মাটিতে ঢেলে ফেলে আরও কিছুটা এগিয়ে খিঁচিয়ে উঠল, “ওলো আগ-ধুমসি (রাগধুমসি)! ওগো ভাগলপুরে গাই! ওলো, আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসাহেব ছিল – জজ সাহেবের লো, ইংরেজের! ”

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণকরে বলে উঠল, “আ-সইরন সইতে নারি, শিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে

মরি! বলি, অ-গজলের মা! ওই জজ সাহেবও আমাদেরই জাত। আমরা ‘আজার’ (রাজার) জাত, জানিস?”

দু-তিনটি ক্রিশ্চান মেয়ে পুঁটের মার এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে খুশি হয়ে বলে উঠল, “আচ্ছা বলেছিস মাসি! ”

খাতুনের মা কাঁখে কলসি, পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে মূলগায়েনের দোয়ারকি করার মতো গজালের মার সুরে সুর মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এইবার আর তার সইল না। ছেলে, পিলে আর কলসি-সমেত সে একেবারে মূলগায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, এবং ক্রিশ্চানদের বউদের লক্ষ করে যে ভাষা প্রয়োগ করল, তা লেখা তো যায়ই না, শোনাও যায় না।

এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে ‘এলোকেশী বামা’হয়ে দাঁড়াল, এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বারকয়েক বিচিত্র-ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল,“তুই আবার কে লো উঝড়োখাগি! তবু যদি ভাতারের ধুমসুনি না খেতিস দুবেলা!”তারপর তার অপ-ভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপ-ভাষায় দিয়ে সে গজালের মা-র পানে চেয়ে বললে, “হ্যাঁ লা ভাতার-পুতখাগি! তিন বেটাখাগি। তোর ছেলে না হয় জজ সাহেবের বাবুর্চিগির করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে। আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবু (রামপ্রসাদ বাবুর) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি! ওই আমফেসাদ বাবু তোদের মউলবি সাহেব নাকি লা? হাত শোঁক এখনও খেরেস্তানের গন্ধ পাবি!”

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মতো ধারালো হাসি হেসে, “বলি ওলো হুতমোচোখি, ওই ‘আমফেসাদ’ বাবু তো আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি! ছেলের বেয়ারাম হয়েলো (হয়েছিল), তাই

ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ও বাড়িতে? বলুক দেখি কোন কড়ুই-রাঁড়ি বলবে!”

শেষের কথাগুলো হিড়িম্বার কানে যায়নি। সে ‘ছিটেন পাড়ার’ (প্রোটেস্টান্ট পাড়ার) পাদরি সাহেব মিস্টার রামপ্রসাদ হাতির বাড়ি চাকরি করতে গিয়ে সত্যিই একবার চাল চুরির জন্য মার খেয়েছিল। কিন্তু সে কেলেঙ্কারির কথাটা এতগুলো মেয়ের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়াতে সে এইবার যা কাণ্ড করতে লাগল – তা অনির্বচনীয়! চুল ছিঁড়ে, আঙুল মটকে, চেঁচিয়ে, কেঁদে, কুঁদে সে যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে গালির বিগলিত ধারা – অনর্গল গৈরিকস্রাব!

যত গালি তার জানা ছিল,ছব্য, অভব্য, শ্লীল, অশ্লীল, সবগুলো একবার, দুবার, বারবার আবৃত্তি করেও তার যেন আর খেদ মেটে না!

‘লুইস-গানার’যেন মিনিটে সাতশো করে গুলি ছুঁড়ছে!

ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল! ঝগড়া তো নয়, মোরোগ-লড়াই!

ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,“ওরে পচা রে, উই শালা পচা! ছুটে আয় রে ছুটে আয়! তোর দিদিমা ‘মা-কালি’হয়ে গিয়েছে!”

এই কুড়ুম-তাল ঝগড়ার মধ্যেও কয়েকটা বউ-ঝি হেসে ফেললে!

মুসলমান তরফের একটা বউ আর থাকতে না পেরে ঘোমটার ভিতর থেকেই বলে উঠল, “হাতে একখানা খাঁড়া দিলেই হয়! ”

তার চেয়েও সুরসিকা একটি আধ-বয়েসি মেয়ে পিছনে থেকে বলে উঠল, “কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকি নেই লো! ”

মুসুলমান ছেলেমেয়েরা যত না হাসে, তত চেঁচায়!

ক্রিশ্চান ছেলেরা ছোঁড়ে ধুলো।

বেধে যায় একটা কুরুক্ষেত্তর!..

কিন্তু দুঃখের ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়ে এ কুরুক্ষেত্র ওকানকার নিত্যঘটনা –একেবারে 'মাছভাত!'

ঝগড়া হতেও যতক্ষণ – ভুলেতেও ততক্ষণ।

দুঃখ অভাব হয়তো এদের মঙ্গলই করেছে। এত দুঃখ যদি এদের না থাকত তাহলে এমন প্রচণ্ড ঝগড়ার পরের দিনই আবার 'দিদি''বুবু''মাসি''খালা'বলে হেসে কথা কইতে ওদের বাধত!

এরা সব ভোলে – না কেবল তাদের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত অভাব!

এই না-ভোলা দুঃখের পাথারের এরা যেন চর-ভাঙা গাছের শাখা ধরে ভেসে চলেছে। দুঃখের যন্ত্রণায় মন থাকে এদের তিক্ত হয়ে, ভাষাও বেরোয় তাই কটু হয়েই, কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখে – সে একা অসহায়, ভাসছে অকূলপাথারে, তখন সে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় –যাকে সে এতক্ষণ ধরে অতিবড়ো কটূক্তি করেছে।

তাদের এ জলের জীবন-যাত্রার কি ডাঙার সুখী মানুষের মতো পরম নিশিন্ত মনে বৎসরের পর বৎসর ধরে এ ওর পানে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবার উপায় আছে?

এ দুঃখের বোঝা যদি এদের এত বিপুল না হয়ে উঠত, তাহলে এরাও এতদিন ভদ্রলোকের মতো মানুষ জাতির মহাশত্রু হয়ে দাঁড়াত – বড়ো বড়ো যুদ্ধ বাধিয়ে দিত!

মৃত্যুক্ষুধা - ০২

গজালের মা-র ছোটোছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার-দলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। কাজও করে –রাজমিস্তিরির কাজ।

বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটু বাবু-গোছ হয়ে গেছে। তেড়ি কাটে, ‘ছিকরেট’টানে, পান খায়, চা খায়। পাড়ার মেয়েমহলে তার মস্ত নাম। বলে, – “যেমন গলা, তেমনই গান, তেমনই শৌখিন! ’ঠিয়েটরে’লাচে বাবুদের ঠিয়েটরে, ওই খেরেস্তান পাড়ার যাত্তার গানে লয়। হুঁ হুঁ!”

সে যখন ‘ফুট-গজ’‘কন্নিক’আর ‘সুত’নিয়ে ‘ছিটরেট’টানতে টানতে কাজে যায় আর যেতে যেতে গান ধরে, তখন পাড়ার বউ-ঝিরা ঘোমটা বেশ একটু তুলেই তার দিকে চায়। ‘ভাবি'(বউদি) সম্পর্কের কেউ হয়তো একটু হাসেও। আর অবিবাহিতা মেয়ের মায়েরা আল্লা মিয়াঁকে জোড়া মোরগের গোশতের লোভ দেখিয়ে বলে, “হেই আল্লাজি, আমার কুড়ুনির সাথেই ওর জোড়া লিখো।”

ঘরে সেদিন চা ছিল না। তাই প্যাঁকালে নেদেরপাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হতে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়বার জোগাড় করছিল।

তার মা একটু অনুনয়ের স্বরেই বললে “হ্যাঁ রে, তুই যে কাজে যাচ্ছিস বড়ো? এদিকে যে পাঁচি আমার মরে! দেখ না একটু কাঠুরে পাড়ার দাই মাগিকে। কাল আত্তির(রাত্তির) থেকে কষ্ট খাচ্ছে, এখনও তো কিছু না।”

প্যাঁকালে তখন কন্নিক ফুটগজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার তেলচিটে চুলে বেশ করে বাগিয়ে তেড়ি কাটছিল। আয়নায় অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আসছে।

চার আনা দামের একটি আয়না সে কিনেও ফেলেছিল একবার, কিন্তু একদিন চা খাওয়ার পয়সা না থাকাতে সেটা দু পয়সায় বিক্রি করে দোকানে চা খেয়ে এসেছে। এখন যা পায়, তাতে চালই জোটে না দুবেলা, তা আয়না কিনবে কী!

কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়িতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছ আনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও বের করতে হয় কোঁচড় থাকে।

বয়স তার এই আঠারো-উনিশ। কাজেই চেয়ে না-পাওয়ার দুঃখটা ভুলতে আজও তার বেশ একটু সময় লাগে। কিন্তু তার আয়নার জন্য তার পিতৃহীন ছোটো ছোটো ভাইপো ভাইঝিগুলি ক্ষুধিত থাকবে – এ যখন মনে হয়, তখন তার নিজের অভাব আর অভাবই বোধ হয় না।

সেদিন ঝগড়ার ঝোঁকে হিড়িম্বা সবচেয়ে ব্যথা-দেওয়া গাল তার মাকে যেটা দিয়েছিল, সে ওই ‘তিনবেটাখাগি’। সত্যিই তো পাহাড়ের মতো জোয়ান তিন ভাই-ই তার মার চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে মরে গেল! তার ওপর আবার সবার দু-চারটে করে ছেলেমেয়ে আছে; এবং তারা সর্বসাকুল্যে প্রায় এক ডজন।

এই শিশুদের এবং তার বিধবা ভ্রাতৃজায়াদের বোঝা বইবার দায়িত্ব একা তারই। কিন্তু বোঝা তাকে একা বইতে হয় না। তার মা এবং ভ্রাতৃজায়ারা মিলে ও-বোঝা হালকা করবার জন্য দিবারাত্তির খেটে মরে। ওতে বোঝা হালকা হয়তো একটু হয়, কিন্তু ক্লান্তি কমে না। ওরা যেন মস্ত একটা খাড়া পাহাড়ের গড়ানে ‘খাদ’বেয়ে চলেছে, মাথায় এঁটে-দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থামলেই বোঝা-সমেত হুড়মুড় করে পড়বে কোন এক অন্ধকার গর্তে!

গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া! কিছুদিন থেকে আবার ওর ছোটো বোনটাও এসে ওদের ঘাড়ে চড়েছে! বিয়ে দিয়েছিল ওর ভালো বর-ঘর দেখেই! কিন্তু কপালে সুখ লেখা না থাকলে সে কপাল পাথরে ঠুকেও লাভ নেই! ওতে কপাল যথেষ্টই

ফোলে, কিন্তু ভাগ্য একটুও ফোলে না – পাঁচির স্বামী নাকি কোন এক ক্যাওরার মেয়েকে মুসলমান করে নেকা করেছে! কিন্তু তার স্বামীর অর্ধেক রাজত্বে পাঁচির মন উঠল না। একদিন তার অনাগত শিশুর শুভ সংবাদসহ অর্ধেক রাজত্বের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে মায়ের দুঃখের কোলেই সে ফিরে এল।

অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মতো পীড়াদায়ক বুঝি আর কিছু নেই! শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়তো করা যায়, কিন্তু শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু-হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়েও ঢাকা যায় না।

পাঁচি এল চোখ-ভরা জল নিয়ে। দুঃখিনী মা তার চোখের জল মুছাবারও সাহস করলে না। বড়ো আদরের একটি মাত্র মেয়ে তার– তার সর্বকনিষ্ঠ কোল-পোঁছা সন্তান। বুকে সে তুলে নিল তাকে, কিন্তু তাতে শান্তি সে পেল না, বুক তার ফোটে যেতে লাগল কান্নায়, বেদনায়! মা কেঁদে উঠল, “ওরে হতভাগিনি মেয়ে, এ কাঁটার বুকে শুধু যে ব্যাথাই পাবি মা আমার ! এখানে সুখ-শান্তি কোথায়?”

মেয়ের প্রথম সন্তান পিত্রলয়েই হয় –এ-ই দেশের চিরচলিত প্রথা। অতি বড়ো দুঃখীও তার মেয়ে প্রথম সন্তান-সম্ভাবিতা হলে নিজ গিয়ে মেয়েকে আনে, সাধ আরমান করে, মেয়েকে ‘সাধ’খাওয়ায়। পাঁচি যখন প্রসব-বেদনার আর্তনাদ করছিল অথচ অর্থাভাবে ধাত্রীও ডাকতে পারা যাচ্ছিল না কাল রাত্রি থেকে, তখন তার মা-র যন্ত্রণা বুঝছিলেন – যদি বেদনার বোধশক্তি তাঁর থাকে – এক অন্তর্যামী!

নিজে থেকে এসেছে বলেই – এবং মেয়ের কপাল পুড়েছে বলেই কি তার যত্ন-আদ্দরও হবে না একটু? কিন্তু হয় কীসে? –নিঃসম্বল জানি কাঁদে, ছুটে বেড়ায়, কিন্তু করতে কিছুই পারে না।

ছেলের ওপর অভিমান করে কিছুই বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু আর সে থাকতে পারল না। ছেলের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, “ওরে, পাঁচি যে আর বাঁচে না।”

চা খেয়ে এসেও প্যাঁকালের উষ্মা তখনও কাটেনি। সে তেড়ি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, “মরুক! আমি তার কী করব? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি?”

সত্যিই তো, সে কী করবে! টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায়!

হঠাৎ পুত্র তুলে ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল, “রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মা-র সঙ্গে, নইলে সে-ই তো এতখন নিজে থেকে এসে সব করত!”

নুলোর মা আর কেউ নয়, –আমাদের সেই ভীমা প্রখর-দশনা শ্রীমতী হিড়িম্বা! এবং সে শুধু ঝগড়া করতেই জানে না, একজন ভালো ধাত্রীও।

ইতিমধ্যেই পাঁচি চিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। মায়ের প্রাণ, আর থাকতে পারল না। বউদের মেয়েকে দেখতে বলে সে তাড়াতাড়ি হিড়িম্বাকে ডাকতে বেরিয়ে পড়ল।

হিড়িম্বা তখন তার বাড়ির কয়েকটা শশা হাতে নিয়ে বাবুদের বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছিল। পথে গজালের মা-র সঙ্গে দেখা হতেই সে মুখটা কুঁচকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু গজালের মা-র তখন তা লক্ষ করবার মতো চোখ ছিল না। সে দৌড়ে হিড়িম্বার হাত দুটো ধরে বললে, “নুলোর মা, আমায় মাফ কর ভাই! একটু দৌড়ে আয়, আমার পাঁচি আর বাঁচে না!”

হিড়িম্বা কথা কয়টা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে গেল। সে একটু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “এ কী ন্যাকামি লা? তুই কি আবার কাজিয়া করবি নাকি পাড়ার মাঝে পেয়ে?”

গজালের মা কেঁদে ফেলে বললে, “না বোন সত্য বলছি, আল্লার কিরে! আমার পাঁচির কাল থেকে ব্যথা উঠেছে; ঝগড়া তোর গজালের মা-র সঙ্গেই হয়েছে, পাঁচির মার সঙ্গে তো হয়নি!”

হিড়িম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে “অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি? তা আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে – আর আমায় খবর পাঠাসনি? আচ্ছা মা যাহোক বাবা তুই! আমরা হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ দেখি গিয়ে! ”

হিড়িম্বা যেতেই পাঁচি কেঁদে উঠল, “মাসি গো, আমি আর বাঁচব না।”

হিড়িম্বা হেসে বললে, “ভয় কী তোর মা; এই তো এখনই সোনার চাঁদ ছেলে কোলে পাবি!”

পাঁচি অনেকটা শান্ত হল। ধাত্রী আসার সান্ত্বনাই তার অর্ধেক যন্ত্রনা কমিয়ে দিল যেন। একটু তদবির করতেই পাঁচির বেশ নাদুস-নুদুস একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সকলে চেঁচিয়ে উঠল, “ওলো, ছেলে হয়েছে লো! ছেলে হয়েছে যে!”

ওদের খুশি যেন আর ধরে না! ওরা যেন ঈদের চাঁদ দেখেছে!

হিড়িম্বা মূর্ছিতাপ্রায় পাঁচির কোলে ছেলে তুলে দিয়ে বললে, “নে, ছেলে কোলে কর। সব কষ্ট জুড়িয়ে যাবে!”

পাঁচি আঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল!

নবশিশুর ললাটে প্রথম চুম্বন পড়ল না কারুর, পড়ল দুঃখিনী মায়ের অশ্রুজল!

গজালের মা হিড়িম্বার হাত ধরে বলল, “দিদি, আমায় মাফ কর!”

হিড়িম্বার চোখ ছলছল করে উঠল। সে কিছু না বলে সস্নেহে খোকার কপালে-পড়া তার মায়ের অশ্রুজল-লেখা মুছিয়ে দিলে।

বাইরে তখন ক্রিশ্চান ছেলেদের দেখাদেখি মুসলমান ছেলেরাও গাচ্ছে –

“আমরা জিশুর গুণ গাই।”

মৃত্যুক্ষুধা - ০৩

এই সব ব্যাপারে কাজে যেতে সেদিন প্যাঁকালের বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। তারই জুড়িদার আরও জন তিন-চার রাজমিস্তিরি এসে তাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিলে।

প্যাঁকালে না খেয়েই তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এল। সে জানত কাল থেকে চালের হাঁড়িতে ইঁদুরদের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা বসেচে। তাদের কিচিরমিচির বক্তৃতায় আর নেংটে ভলান্টিয়ারদের হুটোপুটির চোটে সারারাত তার ঘুম হয়নি।

কিন্তু চাল যদিবা চারটে জোগাড় করা যেত ধারধুর করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও-ঘর নিকুতে সন্ধে হয়ে যাবে।

ঘরে তাদের চালের হাঁড়িগুলো যেমন ফুটো, চালও তেমনই সমান ফুটো। সেখানেই বাসা বাঁধবার খড় না পেয়ে চড়াই পাখিগুলো অনেকদিন হল উড়ে চলে গেছে। কিন্তু অর্থের চেয়েও বেশি টানাটানি ছিল তাদের জায়গার।

যেটা উনুন-শাল, সেইটেই ঢেঁকিশাল, সেইটেই রান্নাঘর এবং সেইটেই রাত্রে জনসাতেকের শোবার ঘর। তারই একপাশে দরমা বেঁধে গোটা বিশেক মুরগি এবং ছাগলের ডাক-বাংলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

প্যাঁকালে না খেয়েই কাজে গেল, তার মা-ও তা দেখলে। কিন্তু ওই শুধু দেখলে মাত্র, মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন, চোখে কিন্তু তার জল দেখা গেল না। বরং দেখা গেল সে তার মায়ের আঁতুড়-ঘরে ঢুকে খোকাকে কোলে নিয়ে দোলা দিতে দিতে কী সব ছড়া-গান গাচ্ছে।

একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকালমৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে।

প্যাঁকালে যেতে যেতে তার মা-র খুশিমুখ দেখলে, বোনের ছেলেকে নিয়ে গানও শুনল। চোখ তার জলে ভরে এল। তাড়াতাড়ি কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে হাসতে হাসতে বার হয়ে পড়ল!

রাজমিস্ত্রিদলের মোনা প্যাঁকালের সুরকি-লাল কোটটার পকেটে ফস করে হাত ঢুকিয়ে বললে, "লে ভাই একটা 'ছিকরেট'বের কর! বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ, শালা হয়তো এতক্ষন দাঁত খিঁচুচ্ছে।"

প্যাঁকালে পথ চলতে চলতে বলল, "ও গুড়ে বালি রে মনা, ছিকরেট ফুরিয়ে গেছে।" আল্লারাখা তার কাছা খুলে কাছায়-বাঁধা বিড়ির বান্ডিলটা সাবধানে বের করে বললে, "এই নে, খাকি ছিকরেট আছে, খাবি?"

কুড়চে বান্ডিল থেকে ফস করে একটি বিড়ি টেনে নিয়ে, সায়েবদের মতো করে বাম ওষ্ঠপার্শ্বে চেপে ধরে ঠোঁট-চাপা স্বরে বললে, "জিয়াশলাই আছে রে গুয়ে, জিয়াশলাই?"

গুয়ে তার 'নিমার'ভেতর-পকেট থেকে বারুদ-ক্ষয়ে-যাওয়া ছুরিমার্কো দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে কুড়চের হাতে দিয়ে বললে, "দেখিস, একটার বেশি কাঠি পোড়াসনে যেন। মাত্তর আড়াইটি কাঠি আছে।"

কুড়চে কাঠির ও খোলার দুরবস্থা দেখে বললে, "তুই-ই জ্বালিয়ে দে ভাই, শেষে বলবি, শালা একটা কাঠি নষ্ট করে ফেললে!"

গুয়ের ওদিক দিয়ে মস্ত নাম। ঝড়ের মধ্যেও সে এমনই কায়দা করে দেশলাই ধরাতে পারে যে, কাঠিটা শেষ হয়ে না পোড়া পর্যন্ত নিবে না!

দেশলাইয়ের খোলার ঘষা-বারুদে গুয়ে কৌশলের সঙ্গে আধখানা কাঠিটি নিয়ে একটি ছোট টোকা মেরে জ্বালিয়ে ফেলেই দুই হাতের তালু দিয়ে তার শিখাকে

বাতাসের আক্রমণ হতে রক্ষা করে এমন করে কুড়চের মুখের সামনে ধরলে যে, তা দেখবার জিনিস।

বিড়িটা যতক্ষণ না আঙুল পুড়িয়ে ফেললে, ততক্ষণ এ-মুখ ও-মুখ হয়ে ফিরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্দার মিস্তিরির, আর যার বাড়িতে কাজ করছে তার চৌদ্দ-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধও হতে লাগল।

‘ওমান কাতলি’পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা। একটা বিশিষ্ট ঘরের সামনে গিয়েই প্যাঁকালে গান ধরে দিলে:

“কালো শশী রে, বিরহ-জ্বালায় মরি!”

তাকে কিন্তু বেশিক্ষণ বিরহ-জ্বালায় মরতে হল না! বাড়িতে ভিতর থেকে কলসি-কাঁখে একটি কালোকুলো গোলগাল মেয়ে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি যেন একখানা চার পয়সা দামের চৌকো পাউরুটি! কিন্তু মোটা সে একটু বেশি রকমের হলেও চোখে-মুখে তার লাবণ্য ছিল অপরিমিত, চোখ দুটি যেন লাবণ্যের কালো জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরী – সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে ভুরু জোড়া যেন গাঙ-চিলের ডানা – ওই সফরীর লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

না-বলা কথার আবেশে পাতলা ঠোঁট দুটি কাঁপছে নিমপাতার মতো।

নাকটি যেন মোহনবাশিঁ। চিবুকের মাঝখানটিতে নাশপাতির মতো ছোট টোল।

শ্রাবণ-রাতের মেঘের মতো চুল।

কিন্তু মুখের ওর এত যেন লাবণ্যকে যেন বিদ্রুপ করেছে ওর বাকি শরীরের স্থূল চৌকো গড়ন।

মেয়েটি মধু ঘরামির। মধু আগে মুসলমান ছিল, এখনও ‘ওমান কাতলি’হয়েছে।

মেয়েটির নাম কুর্শি। বয়স চৌদ্দর কাছাকাছি। দেখে কিন্তু ষোলো-সতেরো বলে ভ্রম হয়। একটু বেশি বাড়ন্ত।

সর্দার মিস্তিরির মিষ্টি আলোচনা তখন দলের মধ্যে এমনই জোরের সঙ্গে চলছিল যে, তারা দেখতেই পেলে না, কখন কুর্শি তাদের কচার বেড়ার ধারে চোখ-ভরা ইঙ্গিত নিয়ে এসে দাঁড়াল এবং প্যাঁকালেও হঠাৎ পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু কথা বলবার তারা সুযোগ পেলে না। পিছনে একটা গোরুর গাড়ি আসছিল – প্যাঁকালে তা খেয়াল করেনি। গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু মেয়েটার গতিবিধি লক্ষ করছিল। কচাগাছের কাছে কলসি নিয়ে সাতজন্ম দাঁড়িয়ে থাকলেও যে জল পাওয়া যায় না, এ তো জানা কথা। গাড়োয়ানটা তার উৎসাহ থামিয়ে রাখতে পারল না। হঠাৎ গেয়ে উঠল :

"ছোঁড়ার মাথায় বাবরি-কাটা চুল,
হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল!"

গান তো নয়, ঋষভ চিৎকার! সে চিৎকারে ছোঁড়া-ছুঁড়ির প্রেম ততক্ষণে হৃদয়দেশ ত্যাগ করে বহু ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে গেছে!

প্যাঁকালে অকারণে পাশের রেতো কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। গাড়োয়ান শুনতে পায় এমনই চেঁচিয়ে বললে, "এই! আমার বঁড়শিটা কখন দিবি?"বলা বাহুল্য, কামরাকে সে বঁড়শি গড়তে কোনোদিনই দেয়নি।

ওদিক কুর্শি হঠাৎ কলসি নামিয়ে একটা কচার ডাল ভেঙে পাশের ছাগলটাকে অকারণে দু ঘা কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "পোড়ারমুখির ছাগল রোজ রোজ এসে বেগুন গাছ খেয়ে যাবে!"

এখানেও বেগুন গাছের উল্লেখটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

রসিক গাড়োয়ান গান গাওয়ার মাঝে ডাইনের বলদটার ঠেসে ল্যাজ মুচড়ে দিয়ে এবং বামের বলদটার তলপেটে বাম পা-টার সাহায্যে বেশ করে কাতুকুতু দিয়ে, –জিহ্বা ও তালু-সংযোগে জোরে দুটো টোকা মেরে শেষের কলিটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল – "ও ছুঁড়িরা মজাইল, হায় ছুঁড়িরা মজাইল কুল।"

যন্ত্রণায় ও কাতুকুতুর ঠেলায় বলীবর্দ যুগল ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছুট দিল।

প্যাঁকালে একবার হতাশ নয়নে ছাগল-তাড়না-রত কুর্শির দিকে তাকিয়ে দৌড়ে জুড়িদের সঙ্গ নিল। তখনও গাড়ি ছুটছে, কিন্তু গাড়োয়ানের মুখ ফিরে গেছে পিছন দিকে।

গাড়ির ধুলোর ভয়ে দলের ওরা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। জনাব বলে উঠল "উঃ শালার গলা তো নয়, যেন হাঁড়োল! ও শালা কে রে?"

প্যাঁকালে কটু কণ্ঠে বলে উঠল, "ওই শালা ন্যাড়া গয়লা – শালা গান করছে না তো, যেন হামলাচ্ছে।"

সকলেই হেসে উঠল।

হঠাৎ ওদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, "খড়্‌গ্ পাঁচে!"

অমনই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। যে ওই ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন যে ওই ইঙ্গিত-বাণী উচ্চারণ করলে তার গা টিপে আর একজন আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় রে?"

অদূরে সাইকেল রেখে এক ভদ্রলোক রাস্তার ধারেই একটা অপকর্ম করতে বসে গেছিলেন। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্যাঁকালে বললে, "উ-ই যে নীল চোঁয়ায়!"

এতক্ষণে ওই অপকর্মরত ভদ্রলোকটি দেখে ফেলেছিলেন, এবং এরাও তাঁকে দেখতে পেয়েছিল।

ওই ভদ্রলোকটির বাড়িতেই এরা রাজমিস্তিরির কাজ করে।

এদেশের রাজমিস্তিরিদের অনেকগুলো 'কোডওয়ার্ড' – সাংকেতিক বাণী আছে – যার মানে এরা ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না। 'খড়গ্ পাঁচে'বাবু বা সায়েব আসছে বা দেখছে, আর 'নীল চোঁয়ায়'ব্যবহৃত হয় ওই অপকর্মটির গূঢ় অর্থে।

এর পরেই দলকে দল হঠাৎ এমন সব বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিলে যা শুনে তাদের অতি নিরীহ চির-দুঃখী জন-মজুর ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

মৃত্যুক্ষুধা - ০৪

প্যাঁকালে চলে যাওয়ার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে বিচিত্র সুরে ‘ফরিয়াদ’করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সব-কিছুই বিচলিত হয়।

সেজোবউ হপ্তাকানিক হল টাইফয়েড থেকে কোনো রকমে বেঁচে উঠেছে। কিন্তু ওই বেঁচে উঠেছে মাত্র। বেঁচে থাকার চিহ্ন শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কবরে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না। যেন কুমিরে চিবিয়ে গিলে আবার উগলে দিয়ে গেছে।

কসাই যেমন করে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটিতে মিলে তেমনই করে যেন থেঁতলেছে ওকে।

ওরই কোলে খোকা – স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দু মাসের! জন্মে অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গেছে।

শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না তো নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

ওরা মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, “আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।”

চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

খোকা কান্না থামিয়ে সেই নোনাজল চাটে, আবার কাঁদে।

মেয়েদের ঘর থেকে শাশুড়ি তার নবাগত নাতিকে মেয়ের কোলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে কান্নাকটু কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, "মর মর মর তোরা! এত লোককে নেয়, আর তোদেরই ভুলেছে যম।"তারপর বউদের উদ্দেশ করে বলে, "নে লো বেটাখাকিরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে কা। মাগিরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে সব। বাপরে বাপ! জান যেন তিতবিরক্ত হয়ে গেল!"বলেই সে উচ্চৈঃস্বরে তার মৃত পুত্রদের নাম করে কাঁদে। ততক্ষণে বড়ো-বউ জলের ঘড়াটা নামিয়ে বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোকে ধরতে না পেরে এক বছরের ছোটো মেয়েটার পিঠেই মনের সাধে ঝাল মেটাতে থাকে।

মেজোবউ ছাড়াতে যায়, পারে না। মেয়েটাকে ছাড়াতে গিয়ে তারও পিঠে পড়ে দু-এক ঘা! মেজোবউ হাসে, আর বাকি ছেলেগুলোকে পালাবার ইঙ্গিত করে।

তার নিজের ছেলেমেয়ে দুটির দিকে চেয়েও দেখে না। ওরা যেন ওদের মায়ের গুণ পেয়েছে। বাড়ির মধ্যে ওই ছেলেমেয়ে কয়টাই যা শান্ত। খিদে পেলে চুপি চুপি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "মা,বড্ড খিদে পেয়েছে।"

আজও মেজোবউ যখন বড়োবউ-এর ক্রন্দনরত ছোটো মেয়েটাকে বুকে করে দোলা দিতে দিতে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তখন তার ছেলেমেয়েরা স্থির সান্তভাবে একটা কাঁচা কয়েতবেল ভেঙে সেইটে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করছিল। কেবল ছোট ছেলেটি তার মায়ের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "বুবু। অ-বু-উ! মা আবার মেনিকে নেমিয়ে দেবে কোল থেকে?"

কাঁচা কয়েতবেলের কষার রসে তার বুবুর জিহ্বা তখন তালুতে ঠেকেছে গিয়ে। সে কোনোরকমে বললে, "হুঁ"।

মেজোবউ তার ছেলেমেয়ের দিকে ফিরে বললে, "পটলি, যা দেখি চারটে কাঠ কুড়িয়ে আন গিয়ে, আমি তোদের তরে ক্ষীর রেঁধে দিচ্ছি।"

মায়ের ভয়ে যে ছেলেমেয়ে কয়টির এতক্ষণ উদ্দেশ ছিল না, ক্ষীরের উল্লেখে তারা এইবার যেন মন্ত্রবলে পাতাল ফুঁড়ে বেড়িয়ে এল।

মেজোবউকে ঘিরে নেচে-কুঁদে তার কাপড় টেনে চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে ওরা যেন একটা পেল্লায় কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। যেন মেজোবউকে ছিঁড়ে খাব।

এক পাল ছাতার পাখি যেন একটা পোকা দেখতে পেয়েছে।

মেজোবউয়ের ছোটো ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এইবার সে আস্তে আস্তে তার ক্রন্দন-রত দাদির কোলে এসে বসে কী ভাবতে লাগল; তারপর তার গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাটা খুলে দাদির চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, "দাদি, চুপ কর, মা ক্ষীর রাঁধছে, তুই খাবি, আমি খাব, বু খাবে।"

তার দাদির কান্না থামে। ওই ক্ষুদ্র শিশু! তার বাবাও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এমনটিই দেখতে। কার জন্য কাঁদছে সে? এই তো তার সোভান। ওই যাদের এত করে গালি দিচ্ছিল সে, তারাই তো তার বারিক গজালে। খিদে পেলে এমনই করে কাঁদত তারা। কাঁদলে সোভান এমনই করে কোলে বসে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলত, "মা, তুই কাঁদিসনে, আমি বড়ো হয়ে তোকে তিন কুড়ি টাকা এনে দেব।"কে বলে সোভান মরেছে? এই তো সে-ই এসেছে আবার তেমনই খোকাটি হয়ে। এই তো রয়েছে তার গলা জড়িয়ে ধরে। চুমায় চোখের জলে শিশুর মুখ অভিষিক্ত করে দেয়।

শিশুর ক্ষুদ্র মুখ ঝলমল করে চিরদুঃখিনীর কোলে –যেন বর্ষা রাতের ম্লান চাঁদ।

শিশু হঠাৎ দাদির কোল থেকে উঠে দৌড়ে মায়ের গায়ে মাথা হেলান দিয়ে বসে। আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কী ভাবে। চোখের সামনে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুঘু উড়ে যায়। নীল স্বচ্ছ আকাশ রোদ লেগে যেন আরও করুণ হয়ে ওঠে। কত দূর ওই আকাশ!

হঠাৎ সে মার আঁচল টেনে বলে,"মা, তুই যে বলেছিলি, ক্ষীর-পরবের দিন বা-জান (বাবা) আসবে। আজ আমরা ক্ষীর রাঁধছি যে, বা-জান আসবে ও-ই মেঘ ফুঁড়ে! লয়?"

মা শুকনো পাতার উপর লুটিয়ে পড়ে। মুখের গান তার চোখের জলে ভেসে যায়!-

শুকনো আমপাতা আপন মনে পুড়তে পুড়তে তার দিকে এগোয়।

শাশুড়ি ছুটে এসে লুটিয়ে-পড়া বউকে তুলবার চেষ্টা করতেই মেজোবউ অমনি ধড়মড়িয়ে ওঠে, তারপর কাঠি দিয়ে উনুনে পাতা ঠেলে।

এইবার খোকা কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে।

তার দাদি বলে, "দেখ বউ, সোভান দিনরাত এমনই মন-মরা হয়ে থাকত ছেলেবেলা থেকেই।"

মেজোবউ আবার গুন গুন করে গান করে।

শাশুড়ি বলে, " আ মলো যা! ছুঁড়ি যেন দিনকের দিন কচি খুকি হয়ে উঠছে! যখনই কান্না, তখনই হাসি।" বলেই খোকাকে টেনে কোলে তুলে অকারণে সারা উঠান ঘুরে বেড়ায়।

খোকা অনর্গল প্রশ্ন .করে, "দাদি গো, বা-জান এখণ খু-ব বড়ো হয়ে গেয়েছে – লয়? সেই যে কয়েছিল, আমার জন্যে বিস্কুট আনবে –। হু-ই গোয়াড়ির বাজার – সে এনেক দূর! লয় দাদি? এনেক দিন লাগে যেতে আসতে। লয় দাদি? আমার লাল জামাটা লালুকে দিয়ে দিব, বা-জান আর একটা লাল জামা আনবে। লয় দাদি?

দাদি কতক শোনে, কতক শোনে না। উঠোনময় ঘুরে বেড়ায়।

সেজোবউ শুয়ে শুয়ে ক্ষীর-রান্না দেখে। কচি ছেলেটা ততক্ষণে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মায়ের বুকের হাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষীর-রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায় – থালা, বাটি, ঘটি, বদনা – তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়।

অপূর্ব সেই ক্ষীর! অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যেটুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তাঁর অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ-পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি-র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না-চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়েছে, তা ওই আধ-সের জলের অনেক বেশি।

বাড়িতে চাল ছিল সেদিন বাড়ন্ত। মুরগির সদ্য খোলা হতে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদগুঁড়ার রিজার্ভ স্টোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ির দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হল এই উপাদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার।

এই তাদের ক্ষীর- পরব ঈদ।

লবণ-সংযোগে শিশুদের সেই অপূর্ব পরমান্ন দেখে চোখে জল এল শুধু মেজোবউয়ের।

সে তাড়াতাড়ি কচার বেড়ার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কয়েকটা কচাপাতা নিয়ে কাঠি দিয়ে সিইয়ে তাই বাটির মতো করে তাতে খানিকটা ক্ষীর ঢেলে সেজোবউয়ের কাছে এনে ধরল।

সেজোবউ উঠে বসে করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, “মেজো-বু, তুমি?”

মেজোবউ একটু হাসলে। রাহুগ্রস্ত চাঁদের কিরণের মতো ম্লান পাণ্ডুর সে হাসি।

সেজোবউ মেজোবউকে জানত। সে আর কিছু না বলে খেতে খেতে হঠাৎ থেমে বলে উঠল, “খোকা কি এই ক্ষীর খাবে মেজো-বু?”

মেজোবউ বললে, “সে কথা তোকে ভাবতে হবে না, খোকার জন্যে দুধ রেখেছি। উঠলে খাইয়ে দেব।”

বড়োবউ জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে হাতটা আগুনের তাতে ধরে বলে উঠল, “উঃ কোমর কাঁকাল ধরে গেল মেজোবউ, কাল থেকে তুই জল আনিস আমি বরং ধান ভানব।” বলেই হাতটা সেঁকতে সেঁকতে বলতে লাগল, “আমার হাত ফুলে গেল, গতরখাগিকে মারতে মারতে। হারামজাদির পিঠ তো নয়, পাথর!”

ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ক্ষীর খেয়ে মহানন্দে ‘বউ পালালো’খেলছে! ওদেরই একজন পলায়নপরায়ণা বধূ হয়ে তার না-জানা বাপের বাড়ির পানে দৌড়েছে এবং তার পিছনে বাকি সবাই গাইতে গাইতে ছুটছে –

“বউ পালাল বউ পালাল খুদের হাঁড়ি নিয়ে,
সে বউকে আনতে যাব মুড়ো ঝ্যাঁটা নিয়ে।”

মৃত্যুক্ষুধা - ০৫

সন্ধে হব-হব সময় প্যাঁকালে হাতে চাল-ডাল, বগলতলায় ফুটগজ, পকেটে কন্নিকসুত, আর মুখে পান ও বিড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

ছেলেমেয়ে তাকে যেন ছেঁকে ধরল।

চাল-ডালের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ দেখে তারা একযোগে চিৎকার করে উঠল। যেন সাপের মাথায় মানিক দেখেছে।

প্যাঁকালে তার কোটের হাতায় হাত দুটো মুছে তিনটে ছোট্ট কাগজের পুরিয়া বের করে বললে, "আজ নলিত ডাক্তারের বাড়ির খানিকটা পলস্তারা করে দিয়ে এই ওষুধ নিয়ে এসেছি সোজা-ভাবির তরে। দাঁড়া, এক পুরিয়া খাইয়ে দিই আগে।"

সেজোবউ ওষুধ দেখে খুশি হয়ে বলে উঠল, "ই কোন ওষুধ ছোটো-মিয়েঁ? এলোপাতাড়ি না হৈমুবাতিক?"

প্যাঁকালে বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললে, "ই এলিওপাতি নয় সেজো-ভাবি, হোমিওবাতি। গুড়ের মতো মিষ্টি। খেয়েই দেখো।"

ওষুধ খেয়ে সেজোবউয়ের মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে উঠছে। সে তার খুশি আর চেপে না রাখতে পেরে বলতে লাগল, "আর দুটো দিন যদি ওষুধ পাই মেজোবুবু, তাহলে আসছে-মাস থেকেই আমি একা একরাশ ধান ভানতে পারব।"

মেজোবউ চাল-ডাল তুলতে তুলতে বললে, " তাই ভালো হয়ে ওঠ ভাই আল্লা করে, আমি আর পারি না ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আমার কাপড় সেলাই-ই ভালো, ওতে দু পয়সা কম পেলেও সোয়াস্তি আছে। "

বড়োবউ বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে তার ঘুঁটে-দেওয়া হাতের গোবর চেঁছে তুলতে তুলতে বললে, “ওই সেলাইটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারিসনে মেজোবউ! তবে রিপু করাটা কিন্তু আমায় দিয়ে হবে না।”

মেজোবউ হাসে, আর গুন গুন করে গান করতে করতে মাছ কোটে। ছেলেমেয়েদের দল মেজোবউকে ঘিরে হাঁ করে মাছ কোটা দেখে আর কে মাছের কোন অংশটা খাবে, এই নিয়ে কলহ করে। যেন কাঁচাই খেয়ে ফেলবে ওরা।

বড়ো ছেলেমেয়ে দুটোতে মিলে ইঁদারায় জল তুলে দিতে দিতে বলে, “আচ্ছা ছোটো চাচা, আজ মাছের মুড়োটা তো তুমিই খাবে? পটলি বলছিল, ছোটো-চা আজ আমায় দেবে মুড়োটা!”

প্যাঁকালে স্নান করতে করতে কী ভাবে! শুধু বলে, ‘হুম’ !

তার এই ‘হুঁ’ শুনে ছেলেটি আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলে, “আচ্ছা ছোটো-চা, আমাকে কাল থেকে ‘জোগাড়’ দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও পাড়ার ভুলো তো আমার চেয়ে অনেক ছোটো, সে রোজ দু আনা করে আনে ‘জোগাড়’দিয়ে। – আচ্ছা ছোটো-চা, দু আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?” – তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, “কাল থেকে আমার একা একটা মাছ! দেখাব আর খাব! ওই পটলিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হুঁ।”

তার বোন মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে কী একটা মতলব ঠাওরায়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, “আমিও কাল থেকে দারোগা সায়েবের খুকির গাড়ি ঠেলব – হুঁ হুঁ! আমায় সায়েব তিন ট্যাকা করে মাইনে দেবে বলেছে! দু আনা লয় – তিন ট্যাকা। আমিও তখন ছোটো-টাকে দিয়ে জিলিবি আর মেঠাই আনাব!”

প্যাঁকালে স্নান সেরে তার বোনের আঁতুড়-ঘরে ঢুকে বললে, “কই রে পাঁচি, তোর ছেলে দেখা! ”

পাঁচি কিছু বলবার আগেই ওর মা ছুটে এসে বললে, “হ্যাঁরে প্যাঁকালে, শুধু হাতে দেখবি কী করে!”

প্যাঁকালে নিজের রিক্ততায় সংকুচিত হয়ে বলে উঠল, “আচ্ছা, কাল কিংবা আর একদিন দেখব এসে। আমার - শালা - মনেই ছিল না যে, শুধু হাতে দেখতে নেই।” বলেই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে মেজোবউয়ের কাছে গিয়ে বসল।

মাছটা চড়িয়ে দিয়ে তখন মেজোবউ ভাতের ফ্যান গালছিল। এধার ওধার একটু চেয়ে নিয়ে সে বললে, “সেজোবউ কিন্তু বাঁচবে না ছোটো-মিয়েঁ!” বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগল, “ওরা মায়েপোয়েই যাবে এবার। আজ সারাদিন যা করেছে ছেলেটা! মায়ের বুকে এক ফোঁটা দুধ নাই, আজ এই সব হাঙ্গামে আবার ছাগলটাও ছেড়ে ফেলেছিলাম। ওই ছাগলের দুধই তো বাছার জান! একটুকু দুধের জন্য ছেলেটা যেন ডাঙার মাছের মতো তড়পেছে! তবু ভাগ্যিস, দারোগা সায়েবের বিবি একটুকু দুধ দিয়েছিল। তারই একটুকু রেখেছিলাম, কিন্তু ছেলে তার দু চামচের বেশি খেলে না। কেঁদে কেঁদে এই একটু ঘুমিয়েছে।” বলেই ভাতের হাঁড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে ভাতগুলো উলটে নিয়ে মুখের সরাটা একটু ফাঁক করে পাশে রেখে দিল।

প্যাঁকালে কিছু না বলে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুক্ষুধা - ০৬

হঠাৎ সেদিন সেজোবউয়ের অবস্থা একেবারে যায়-যায় হয়ে উঠল। 'ছিটেন'পাড়ার নকড়ি ডাক্তার তাঁর বৈঠকখানাটা বিনি পয়সায় চুনকাম করে দেওয়ার চুক্তিতে দেখতে এলেন। বললেন, "গরিব লোক তোরা, ভিজিট আমি নেব না বাপু – আমার বৈঠকখানাটায় একটু গোলা দিয়ে দিবি, তা দিনতিনেক খাটলেই চলে যাবে! এ্যাঁ কি বলিস?"

প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

নকড়ি ডাক্তার নাড়ি দেখে বললেন, "অবস্থা বড়ো ভালো ঠেকছে না রে, হার্টফেল করার বড্ড ভয়।"

মেজোবউ ইশারায় প্যাঁকালেকে ডেকে ফিস ফিস করে বললে, "আচ্ছা বেঁহুশ ডাক্তার তো, রোগীর কাছে তার অবস্থা এমনি করে বলে নাকি?"

নকড়ি ডাক্তার বোধ হয় ততক্ষণে মেজোবউয়ের ইশারার মানে বুঝে নিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে প্যাঁকালেকে ডেকে বললে, "ওরে, তোদের বাড়ি মুরগির বাচ্চা আছে তো? একটু ঝোল করে খাওয়া দেখি। এক্ষুণি চাঙ্গা হয়ে উটবে। ভাবিসনে কিছু, ও ভালো হয়ে যাবে খন।" বলেই হাই তুলে দুটো তুড়ি মেরে মেজোবউয়ের মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন গিলে খাবে! মেজোবউ একটু হেসে হেঁসেল ঘরে সরে গেল। বড়োবউ বলে উঠল, "কি লা, হাসছিস যে বড়ো!"

মেজোবউ ডাক্তার শুনতে পায় এমনই জোরেই বলে উঠল, "আখার বাসি ছাইগুলোর কিনারা হল দেখে।" বলেই একটু হেসে আবার বলে উঠল, "যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনই ছাই-পাঁশ নৈবেদ্যি।"

ডাক্তার ততক্ষণে উঠে পড়েছে। তখন রোগীর চেয়ে তার নাড়িই বেশি চঞ্চল।..

মেজোবউয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা যেন একটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা-ধোয়া চাঁদনির মতো আজও ঠিকরে পড়েছে রূপ। পাড়ার মেয়েরা বলে, "মাগি রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্চে দিন-কে-দিন।"

ওর সবচেয়ে বদ-অভ্যাস, কারণে-অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি। - যেন ফুলের ফুটে ওঠা, যেন হঠাৎ চন্দ্রোদয়।

ডাক্তার মেজোবউয়ের শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক জোড়া সাদা পায়রার মতো পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার কলসের মতো ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ি একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের রোগীর মতোই দ্রুত চলছিল।

দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে ডাক্তার বললে, "হ্যাঁরে মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটা ওষুধের জন্য বড্ড দরকার ছিল আমার।"

ডাক্তারবাবু চেয়েছেন, এতেই যেন প্যাঁকালে বাধিত হয়ে গেল। সে অতি বিনয়ের সঙ্গে বললে, "এজ্ঞে, তা আছে বইকী - এই এনে দিচ্ছি।" বলেই সে ঘরে ঢুকতেই মেজোবউ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বললে, "আন্ডা-টান্ডা পাবে না ছোটো-মিয়েঁ! বলে দাও গিয়ে, বাড়িতে আন্ডা নেই। আ মলো, মিনসে যেন কী-বলে-না-তাই। ও আন্ডা কটা বিক্রি করে একবেলার দুমুঠো ভাত উঠবে বাছাদের মুখে।"

প্যাঁকালে ততক্ষণে গোটা আটেক ডিম নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। ডাক্তার স্টেথিসকোপটা তার ঝোলা-পকেট থেকে বের করে দিব্যি খুশি হয়ে ডিমগুলি পকেটস্থ করলেন।

মেজোবউ একটু চেঁচিয়েই বললে, "ডাক্তারের গলায় ওটা কী ঝুলছে ছোটো মিয়েঁ? মিনসে কি গলায় দড়ি দিলে?"

প্যাঁকালে এবার একটু রেগেই বলে উঠল, "তুমি থামো মেজো-ভাবি, সব সময় ইয়ে ভালো লাগে না, হেঁ!"

মেজোবউ সে-কথায় কান না দিয়ে গুন গুন করে গান ধরে –

"কত আশা করে সাগর সেঁচিলাম
মানিক পাওয়ার আশে,
শেষে সাগর শুকাল মানিক লুকাল
অভাগিনির কপাল-দোষে।"

গান তো নয় – যেন বুক-ফাটা কান্না!

বড়োবউ তন্ময় হয়ে শোনে আর বলে, "সত্যি মেজোবউ, বড়ো ঘরে জন্মালে তুই জজসাহেবের বিবি হতিস।" বলেই খুব বড়ো করে নিশ্বাস ফেলে।

মেজোবউ সে-কথার কান না দিয়ে উনুন নিকুতে নিকুতে আপন মনে গেয়ে চলে। যেন তার শ্রোতা এ জগতে কেউ নয়।

"নিঠুর কালার নাম কোরো না,
কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে
কালায় পড়িবে মনে গো!
নিঠুর কালার নাম কোরো না।"

গানের সুর তার অতিরিক্ত কাঁপে – নিশীথ রাতের বাদলা-হাওয়া যেমন করে কাঁপে বেণুবনে।

বড়োবউ সব বোঝে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে যেতে যেতে মেজোবউয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "আজ তুই চোখের পানিতে আখা নিকুবি নাকি?"

সেজোবউয়ের খোকা কেবল কাঁদে – দিবারাত্রি সে-কান্নার আর বিরাম নাই। যেন পাট পচিয়ে তার ছাল-মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে –বাকি আছে শুধু হাড়-প্যাঁকাটি।

মেজোবউ এসে কোলে তুলে নেয়। বলে, “আহা! বাছার পিঠে ঘা হয়ে গেল শুয়ে শুয়ে।” তারপর মনে মনে বলে, “হায় আল্লা, এই দুধের বাচ্চা কী অপরাধ করেছিল তোমার কাছে? মারতেই যদি হয়, এমন কাঁদিয়ে মেরে তুলে নাও বাছাকে।” তারপর বুকে জড়িয়ে চুমো খেতে থাকে।

সেজবউ দেখে আর কাঁদে। বলে “মেজোবু, তুমিই ওর মা। আমি তো চললাম, তুমিই ওকে দেখো। আর যদি ও-ও যায় –”

আর বলতে পারে না, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। পশ্চিমের দিকে মুখ করে সকল অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করে, “আল্লা গো, অনেক দুষকুই দিলে, আর দিয়ো না। বাছাকে যদি নিতেই হয়, আমার দু দিন পরেই নিয়ো।”

মেজোবউ খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বলে, “তুই চুপ কর সেজো! মরতে চাইলেই তোকে মরতে দেব নাকি লা? এই বেটার রোজগার খাবি, বেটার বিয়েতে নাচবি, তারপর নাতিপুতি দেখে তোর ছুটি।”– বলেই ঘুমন্ত খোকার চোখে চুমু খেয়ে বলে, “খোকার বিয়ে দিব কাজীবাড়িতে।”

আবার অকারণ হাসি! হাসিতে মুখ-চোখ যেন রাঙা টুকটুকে হয়ে ওঠে! খোকাকে তার মায়ের পাশে শোয়াতে শোয়াতে গায় –

“জাদু আমার লাঙল চষে, দুধারে তার কালো গোরু,
জাদুর বেছে বেছে বিয়ে দিব পেট মোটা মাজা সরু।”

সেজোবউ হাসে বালুচরে অস্ত-চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিরেখাটুকুর মতো।

মৃত্যুক্ষুধা - ০৭

দিন যায়, দিন আসে, আবার দিন যায়।

এরই মধ্যে একদিন গজালের মা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে একেবারেই মেজোবউয়ের পায়ের ওপর পড়ে মাথামুড়ো খুঁড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গালি, উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয়, বিনয় - তার কতক বুঝা গেল, কতক গেল না।

মেজোবউ তাড়াতাড়ি তার শাশুড়ির মাথাটা জোর করে পায়ের ওপর হতে সরিয়ে দুহাত পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। সে এর কারণও বুঝেছিল। তবু কটু কণ্ঠেই বলে উঠল, “একী মা, তুমি আমার পা ছুঁয়ে আমায় ‘গুনায়’ (পাপে) ফেলতে চাও নাকি? কেন, কী করেছি আমি?”

তার শাশুড়ি কান্না-বিদীর্ণ-কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে লাগল, “তা বলবি বইকী লা, আমার জোয়ান-পুত-খাকি। আমার বেটার মাথা খেয়ে এখন চললি নিকে করতে! - ভালো হবে না লো, ভালো হবে না। এই আমি বলে রাখছি, বিয়ের রাতেই জাতসাপে খাবে তোদের দুই জনকেই।” -আবার চিৎকার!

তখন ভর-দুপুর! প্যাঁকালে কাজে চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে - কেউ কাঠ কুড়োতে, কেউ বা গোবর কুড়োতে।

সেজোবউ শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে। তার পাশে খোকা, যেন গোরস্থানের নিবু-নিবু মৃৎ-প্রদীপের শেষ রশ্মিটুকু। শুধু একটু ফুঁয়ের অপেক্ষায় আছে।

বড়োবউ উঠোন নিকোনো ফেলে স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল, শুনছিল সব। এইবার সে ভয় ও বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, “সত্যি নাকি মেজোবউ?”

মেজোবউ আস্তে বলল, “সত্যি নয়।”

এই দুটি কথার আশ্বাসেই শাশুড়ি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে মেজোবউয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "সত্যি বলছিস মা আমার? সত্যি তুই নিকে করবিনে? তবে যে ভোলাদের ঘরে শুনে এলাম, তোকে নিকে করতে তোর বোনাই কোলকেতা থেকে এসেছে? তাই তো বলি, ওই বুড়ো মিনসে – থাক না ওর টাকা – ওকে কি তুই নিকে করতে পারিস? তাছাড়া মা, তোর এই ছেলেমেয়ে দুটোর মায়াই বা কাটাবি কী করে বল তো? নিকে করলে ছেলেমেয়ে দুটোকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।"

মেজোবউ বড়োবউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে অন্য কাজে গেল।

বড়োবউ মেজোবউ ভালো করেই জানত। সে জানে, মেজোবউ মিথ্যা বলে না এবং যা বলে, তা চিরকালের জন্যই সত্য হয়ে যায়। সে মেজোবউয়ের হাসির মানে বুঝে উঠোন নিকোতে চলে গেল। যেতে যেতে সেও একটু হেসে বলে গেল, "পাড়ার গতর-খাকিদের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমারও মা তেমনই যত সব কি-বলে-না-ইয়ে –"

শাশুড়ি একটু লজ্জিত হয়েই চোখ মুছে বড়োবউ যেখানে উঠান নিকুচ্ছিল, সেখানে এসে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ লা বড়োবউ, সত্যিই ছুঁড়ি নিকে করবে নাতো? ছুঁড়ির যা রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনও, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিনরাত আছে ছুঁড়ির পানে হা-পিত্যেশ করে তাকিয়ে। আ মলো যা! ড্যাকরারা যেন হুলো বেড়াল! ইচ্ছে করে, দিই চোখে 'লগা'ঠেলে। আর ওই বুড়ো মিনসে – ওর বোনের সোয়ামি – মিনসে যে ওর সানি-বাপ! মিনসের লজ্জা করল না কোলকেতা থেকে কেষ্টলগর ছুটে আসতে ওই মেয়ের বয়েসি বউটাকে নিকে করতে! – ঝ্যাঁটা মার! ঝ্যাঁটা মার!"

আরও কত কী বকে যায় আপন মনে।

বড়োবউ আর থাকতে না পেরে একটু রেগেই বলে উঠল, “আচ্ছা মা, তোমার কি কিছুই আক্কেল হুঁশ নেই? ‘যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।’যা নয় তাই। মেজোবউকে যদি তুমি চিনতে, তাহলে এ-কথা বলতে না।” বলেই জোরে জোরে উঠান নিকোয়।

শাশুড়ি বড়োবউয়ের রাগ বুঝতে পারে। অন্যদিন বউ এইরকম করে কর্তা বললে সে হয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলত। কিন্তু আজ সে সব সয়ে যেতে লাগল। তার বউ পর হয়ে যাবে না, এই খুশি যেন তার ধরছিল না। তাই আজ বউয়ের বকুনিও অদ্ভুত মিষ্টি শোনাতে লাগল তার কানে।

কিন্তু আজ অনেক কিছু শুনেও যে এসেছে পাড়াতে – তা সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক। কাজেই পরিপূর্ণ সোয়াস্তি সে পাচ্ছিল না। এও জানত সে যে, মেজোবউকে এর বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে সে হয়তো এক্ষুনি বাপের বাড়িই চলে যাবে। রায়বাঘিনি শাশুড়ি সে, বউদের কথায় কথায় ‘নাকের জলে চোখের জলে’ করে। কিন্তু মেজোবউকে কেন যে তার এত ভয়, কেন যে ওকে আর বউদের মতো করে গাল-মন্দ দিতে পারে না, তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

মেজোবউয়ের দু-দুটো ছেলেমেয়ে হলেও তার শরীরের বাঁধুনি দেখে আজও আইবুড়ো মেয়ে বলেই ভ্রম হয়। বিধবা সে, তবু পান তো খায়ই, দু-একদিন চুড়িও পরে – রঙিন রেশমি চুড়ি। আবার তার পরের দিনই ভেঙে দেয়। কাপড়টাও তার পরবার ঢং একটু খেরেস্তানি ধরনের। সিঁথিটা সে সোজাই কাটে হয়তো; মেয়েরা কিন্তু বলে, ও বাঁকা সিঁথি কাটে। খোঁপায় তার মাঝে মাঝে গাঁদা ও দোপাটি ফুলের গুচ্ছও দেখা যায়। হাসি তো লেগেই আছে ঠোঁটে, তার ওপর দিনরাত গুন গুন করে গান।

তবু পাড়ার কেউ ওর বদনাম দিতে সাহস করেনি আজও। ও যেন পাড়ার ছেলেমেয়ে সব্বারই আদরের দুলালি মেয়ে।

শাশুড়ি যখন-তখন যার-তার কাছে বলে, “মা গো, আমি যেন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি!”

মেজোবউ সত্যিই যেন আগুনের খাপরা। রূপ ওর আগুনের শিখার মতোই লকলক করে! কিন্তু ধরতে গেলে হাতও পোড়ে। ওই হাত পোড়ার ভয়েই হয়তো পাড়ার মুখপোড়ারা ওদিকে হাত বাড়াতে সাহস করে না।

ও যেন বসরা-গোলাবের লতা। শাখা-ভরা ফুল, পাতা-ভরা কাঁটা।

ও যেন বোবা টাকা। শুধু রুপো, খাদ নেই। বাজাতে গেলে বাজে না। লোকে জানে, ও টাকা দিয়ে সংসার চলে না। খুব জোর, গলায় তাবিজ করে রাখা যায়।...

কিন্তু এ নেকার জনরবটা নিছক মিথ্যা নয়।

মেজোবউয়ের বোনের সোয়ামি সত্যি বড়োলোক – কোলকাতার চামড়াওয়ালা। আগে তার নাম ছিল ঘাসু মিয়াঁ, এখন সে ঘিয়াসুদ্দিন আহমদ। পূর্বে সে ঘোড়ার গাড়ি চালাত, এখন ঘোড়ার গাড়িই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

‘ঘিয়াসুদ্দিন’নামে প্রমোশন পেয়ে যাওয়ার পর থেকে সে আর শ্বশুরবাড়ি মাড়ায়নি। স্ত্রী তার চির-রোগী। কাজেই বিয়ে তাকে আরও দুটো করতে হয়েছে। সে বলে, এক বিয়েতে ইজ্জত তাকে না লোকের কাছে। তার শালী – অর্থাৎ মেজোবউকে সে আগেই দেখেছিল। কাজেই মেজোবউ বিধবা হওয়ার পর থেকেই তার শ্বশুরবাড়ির দিকে টানটা আবার নতুন করে আরম্ভ হয়েছে।

বড়োলোক জামাইকে দেখে শ্বশুর-শাশুড়ি খুশির চেয়ে সন্ত্রস্তই হয়ে ওঠে বেশি। নিজেদের দারিদ্র্যের লজ্জায় সর্বদা যেন এতটুকু হয়ে যায় জামাইয়ের কাছে। অবশ্য বাইরে এ নিয়ে বারফট্টাই করতেও ছাড়ে না।

মেজোবউয়ের বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ির একটু দূরেই কুড়চিপোতায়। কাজেই সে যখন ইচ্ছা বাপের বাড়ি চলে যায়। শাশুড়ি এতে মনঃক্ষুণ্ন হলেও জোর করে কিছু বলতে পারে না। ওর সর্বদা ভয়, বেশি টান দিলেই বুঝি এই ক্ষীণ সুতোটুকু ছিঁড়ে যাবে!

শাশুড়ি-মেজোবউয়ের যেন ঘুড়ি খেলা চলছে। মেজোবউ খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে। শাশুড়ি মনে করে, হাতের বন্ধন এড়িয়ে ও চলে যেতে চায় সুতো ছিঁড়ে। তাই বাতাস যত জোর বয়, ও তত সুতো চেপে না ধরে সুতো ছেড়েই দিতে থাকে। কিন্তু ও সুতোরও শেষ আছে! তা ছাড়া ওই পচা সুতোর জোরই বা কতটুকু – তাও তো অজানা নেই ওর। তাই তার অসোয়াস্তির আর অন্ত নেই।

অন্য বউদের নিয়ে সে ভয় নেই বলেই সে ওদের ওপর অত নির্মম হতে পারে। রূপের একটা মোহ আছে। ওতে যে শুধু পুরুষই মুগ্ধ হয় তা নয়, দজ্জাল মেয়েও রূপের আঁচে না গলুক, নরম হয়ে পড়ে অনেকটা।

বাড়ির পশুপক্ষীগুলো পর্যন্ত যেন ওর আকর্ষণ অনুভব করে। ওদের একটা গাই ছিল, দুঃখে পড়ে তাকে বিক্রি করে দিতে হয়েছে, –সে মেজোবউ ছাড়া আর কারুর হাতে সহজে খেতে চাইত না।

গোরুরও বোধশক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন ধলী গাইটাকে কিনে নিয়ে গেল ও পাড়ার রেমো, সেদিন মেজোবউ আর ধলী দুজনার চোখেই জল দেখা গেছিল। আজও প্রায়ই পালিয়ে আসে গাইটা। সারা রাস্তাটা যেরকম ছুটতে ছুটতে আর ডাকতে ডাকতে আসে সে, তা দেখে ও-বাড়ির সবারই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে! এসেই মেজোবউকে দেখে সে কী আকুলি-বিকুলি ওই অবলা পশুর! গা-হাত চেটে চারপাশে ঘুরে তার যেন আর সাধ মেটে না।

বড়োবউ বলে "মেজোবউ, তুই জাদু জানিস।"

যেদিন ঘিয়াসুদ্দিন কুড়চিপোতা আসত, সেই দিনই মেজোবউকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার মা ধন্না দিয়ে বসত এসে। বেয়ানে-বেয়ানে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যেত। মায়ের কান্নায় মেজোবউ না গিয়ে পারত না। এই নিয়ে আসার উদ্দেশ্যও সে বুঝত! কিন্তু ওর ওই রহস্যভরা স্বাভাবটুকুর জন্যই সে হয়তো বা ইচ্ছা করেই যেত।

বড়োবউ হেসে বলত, “আবার আসবি তো মেজো?” মেজোবউ হেসে বলত, “জোড়ে ফিরব বুবু।”

মৃত্যুক্ষুধা - ০৮

সেদিন ঘিয়াসুদ্দিন শ্বশুরবাড়ি এসেছে। মেজোবউও বোনাইকে দেখলতে এসেছে। ও-ই এসেছে কিংবা ওর বোনাই-ই আনিয়েছে – এই দুটোর একটা-কিছু হবে।

আগুন আর সাপ নিয়ে খেলা করতেই যেন ওর সাধ। ঘিয়াসুদ্দিন ওকে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই এত ঘন ঘন আসে। মেজোবউ তা বোঝে, তাই তাকে ঘন ঘন আসায় অর্থাৎ আসতে বাধ্য করে।

সে বলে, "দুলাভাই, তুমি তোমার গাড়িতে চড়ালে না আমায়?"

ঘিয়াসুদ্দিন যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বলে, "এ নসিবে কি তা আর হবে বিবি? আমার গাড়ি তো তৈরিই, তুমি চড়লে না বলেই তো তা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল!"

মেজোবউ মুচকি হাসে। হাসি তো নয়, যেন দুফলা চাকু। বুকে আর চোখে দুই জায়গায় গিয়ে বেঁধে। বলে, "অর্থাৎ আমি গাড়িতে উঠলেই গাড়ি তুলবে আস্তাবলে! বুবুকে যেমন তুলেছ!"

ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ থ বনে যায়। বে-বাগ ঘোড়া হঠাৎ মুখের উপর চাবুক খেয়ে যেমন থতমত খেয়ে যায় তেমনই!

একটু সামলে নিয়ে সে বলে, "আরে তৌবা, তৌবা! ও কী বদরসিকের মতো কথা বল ভাই! আস্তাবলে কেন, গাড়িসুদ্ধ মাথার ওপরে তুলব তোমায়। তোমার বুবু তো বুকে আছেনই।"

মেজোবউ বোনাই-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "আমায় রাখবে একেবারে মাথায়! এই তো? কিন্তু দুলাভাই, তোমাদের মাথা কি সব সময় ঠিক থাকে যে, ওখানে চিরদিন থাকব? আরো দু-দুজনকে তো মাথায় তুলে শেষে পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছ!"

ঘিয়াসুদ্দিনও হটবার পাত্র নয়। সে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, “কিন্তু ভাই, ওরা হল নুনের বস্তা, বেশিদিন কি মাথায় রাখা যায়? তুমি হলে মাথার তাজ, তোমাকে কি তাই বলে মাথার থেকে নামানো যাবে?”

মেজোবউ একটু তেরছা হাসি হেসে কণ্ঠস্বরে মধু-বিষ দু-ই মিশিয়ে বলে উঠল, “জি হাঁ, যা বলেছেন! কিন্তু ও পাকা চুলে আর তাজ মানাবে না দুলাবাই! বরং সাদা নয়ানসুকের কিশতি-নামা টুপি পরো, খাসা মানাবে!” বলেই হি হি করে হাসে।

ঘিয়াসুদ্দিন ঘেমে উঠতে থাকে। কীসের যেন অসহ্য উত্তাপ অনুভব করে সারা দেহে-মনে।

মেজোবউ তখনও বাণ ছুঁড়তে থাকে। শিকারী যেমন করে আহত শিকার না-মরা পর্যন্ত বাণ ছুঁড়তে বিরত হয় না।

সে বলে, “পুরুষগুলো যেন আমাদের হাতের গালার চুড়ি। ভাঙতেও যতক্ষণ, গড়তেও ততক্ষণ!”

ঘিয়াসুদ্দিন কী বলতে কী বলে ফেলে। খেই হারিয়ে যায় কথার। বলে, “আচ্ছা ভাই, তুমি মাথায় না-ই চড়লে, পিঠে চড়তে রাজি তো?”

মেজোবউ এইবার হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে, “হাঁ, তাতে রাজি আছি। যদি চাবুক পাই হাতে!” বলেই বলে, “সেদিন বাবুদের বাড়িতে কলের গানে একটা গান শুনেছিলাম দুলাভাই, “বলেই সুর করে গায় –

“আমার বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে!”

তারপর গান থামিয়ে বলে, “বুবু আছেন বুকে, এরপর আমি চড়ব পিঠে, তাহলে তোমার অবস্থা ওই সেঁটে ধরার মতোই হবে যে! তাছাড়া, জান তো একজন বুকে বসে থাকলে আর একজন পিঠে চড়তে পারে না!”

গান শুনে মেজোবউয়ের বড়ো ভাবি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে এইবার বলে উঠল, “কী লো, বোনাই-এর সাথে যে হাবুডুবু খাচ্ছিস রসে?”

ঘিয়াসুদ্দিন এতক্ষণে যেন কূলের দেখা পেলে বড়ো শালাজকে পেয়ে। এইবার সে অনেক সপ্রতিভ হয়ে বললে, “বাবা, নদের মেয়ে ডাক-সাইটে মেয়ে, এদেশে রসিকতা করে পার পাওয়ার জো আছে? ভাগ্যিস এসে পড়েছে ভাবি, নইলে, এখুনি ডুবে মরেছিলাম আর কী!”

মেজোবউ তার ভাবির দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললে, “কোথায় ডুবেছিলে, খানায় না সার-কুঁড়ে? – কিন্তু অত ভরসা কোরো না দুলা-ভাই, ও কলার ভেলা। ডুবোতে বেশি দেরি লাগবে না।”

ঘিয়াসুদ্দিন হতাশ হয়ে তক্তাপোশে চিতপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, “না ভাবি, কোনো আশা নেই!”

ভাবি হাসতে হাসতে বলে চলে গেল, “অত অল্পে হতাশ হতে নেই ভাই পুরুষ মানুষের। যেখানে শক্ত মাটি, সেখানে একটু বেশি না খুঁড়লে পানি পাওয়া যায় না।

মেজোবউ কিছু না বলে তামাক সেজে ঘিয়াসুদ্দিনের হাতে হুঁকো দিয়ে বললে, “এইবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দাও দেখি একটুকু, সব পরিষ্কার দেখতে পাবে।”

ঘিয়াসুদ্দিন হুঁকোটা হাতে নিয়ে একবার করুণ নয়নে মেজোবউয়ের পানে চেয়ে বলল, “যথেষ্ট পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি ভাই। ধোঁয়া হয়ে রইলে কিন্তু তুমিই।”

বলেই জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হুঁকোয় মন দিলে।

মেজোবউ কৌতুক-ভরা চোখে একবার বোনাই-এর পানে চেয়ে উঠবার উপক্রম করতেই ঘিয়াসুদ্দিন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললে, "একটু দাঁড়াও ভাই, একটা কাজ আছে।" বলেই তার হাতের কাজের বাক্সটা হতে একখানি সুন্দর ঢাকাই শাড়ি বের করে বললে, "এইটে তোমায় নিতে হবে ভাই!"

মেজোবউ শাড়িটার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হেসে বললে, "আগে থেকেই কাপড়ের পর্দা ফেলে দিলে বুঝি? কিন্তু এ যে ঢাকাই কাপড় দুলাভাই, বড্ড পাতলা। আমি যে বিধবা, সে ঘা তো এ পাতলা কাপড়ে ঢাকা পড়বে না।"

বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছে চলে গেল। ঘিয়াসুদ্দিনের হাতের কাপড় হাতেই রয়ে গেল।

একটু পরেই মেজোবউ হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, "ওকীদুলাভাই, তুমি এখনও কাপড় হাতে করে বসে আছ? দাও দাও, মন খারাপ করতে হবে না।" বলেই কাপড়খানি হাতে নিয়ে গুন গুন করে গান করতে করতে বেরিয়ে গেল, – "তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে, আমায় ধরতে পারলি না!"

একটু পরেই উঠানে মেজোবউয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "না ভাবি, আজ আসি! শাশুড়ি বোধ হয় এতক্ষণ তাঁর মরা ছেলেকে নালিশ করছেন আমার নামে? ও কাপড়টা তোমায় দিলাম। এ পোড়া গায়ে কি অত রং চড়াতে আছে? চটে যাবে। – বিনি রঙেই কত বুড়োর চোখ গেল ঝলসে, রং চড়ালে না জানি কী হবে!" বলেই বোনাই¬-এর পানে তাকায়। তারপর ছেলেমেয়ে দুটির হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সারা পথ তার পায়ের তলায় কাঁদতে থাকে!

মৃত্যুক্ষুধা - ০৯

সেদিন বড়োবউ, প্যাঁকালে, তার মা আর পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শসভা বসেছিল।

প্যাঁকালের অতিমাত্রায উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমি তা কখনও পারব না। আমি কালই চললাম রানাঘাট। সেখেনে রোজ চোদ্দো আনা করে পয়সা পাব।"

তার মা অনুনয়ের স্বরে বললে, "রাগ করিস কেন বাবা? এমন তো সব গরিব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তা ছাড়া ওর চাঁদপনা মুখ যে কিছুতেই ভুলতে পারিনে। অমন বউ পর হয়ে যাবে। আমার কপালই যদি না পুড়বে তাহলে সোভানই বা মরবে কেন, আর তোকেই বা এ উপরোধ করতে যাব কেন?"

পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, "তা ভাই, তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা! অমন তো কতই হচ্ছে! একদিন ভাবি বলেছ বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই! দুদিন বাধবে, তা-পর আপনি সরগড় হয়ে যাবে বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই! দুদিন বাধবে, তা-পর আপনি সরগড় হয়ে যাবে, দেখে নিয়ো।"

প্যাঁকালে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, "তুই থাম পাঁচি। যা লয় তাই! তুই তবে কেনে নিকে করলিনে তোর ভাসুরকে?"

পাঁচি ছেলের মা হলেও তার ছেলেমানুষি করার বয়স আজও যায়নি। তার ভাসুরকে নিকে করার ইঙ্গিত শুনে সে একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে বলে উঠল, "তা ইখেনে নিকে করবে কেনে, কুর্শিকে যে বিয়ে করবে খেরেস্তান হয়ে!"

প্যাঁকালে রেগে উঠে যেতে যেতে বললে, "রইল তোর নিকে, আমি চললুম!" বলেই বেড়িয়ে গেল!

বড়োবউ বললে, “তখনই বলেছিলাম মা, যে, এ হয় না। তা ছাড়া, তোমার ছেলে রাজি হলেও সে যা মেয়ে – সে কিছুতেই রাজি হত না।”

শাশুড়ি মস্ত বড়ো একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, “কপাল মা, কপাল! কী করবি বল! ওই বুড়ো মিনসেই ছিল ছুঁড়ির কপালে। বলেই সোভানকে উদ্দেশ করে কান্না জুড়ে দিল।

বড়োবউ একটু রেগেই বললে, “তোমারই মা বাড়াবাড়ি! জান যে মেজোবউ ও নিকেতে রাজি নয়, তবু ওই নিয়ে দিনরাত কান্নাকাটি। তুমিই তাড়াবে এমনি করে মেজোবউকে!”

এমন সময় মেজোবউ তার বাপের বাড়ি থেকে এসে পৌঁছল। বড়োবউ হেসে বললে, “কি লো, জোড়ে ফিরলি, না বিজোড়ে?”

মেজোবউ বড়োবউয়ের রহস্যের উত্তর না দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, “তা তোমরা যে-রকম করে তুলছ অবস্থা, তাতে জোড়াই খুঁজে নিতে হবে দেখছি আমায়।” বলেই শাশুড়ির দিকে চেয়ে বললে, “মাগো মা! পাড়ায় ঢি-ঢিক্কার পড়ে গেল এই নিয়ে! কেলেঙ্কারির আর বাকি রইল না! আচ্ছা মা, এমনি করে তুমি আমায় দেশ-ছাড়া করতে চাও নাকি? তুমি জান, আমার বোন বেঁচে রয়েছে আজও। এক বোন বেঁচে থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় কি-না, যাও মউলবি সায়েবকে জিজ্ঞেস করে এসো?” বলেই দাওয়ায় বসে পড়ে পা দুলোতে লাগল। ছোটো মেয়ে রাগলে যেমন করে।

বড়োবউ খুশি হয়ে বলে উঠল, “ঠিক বলেছিস মেজোবউ। দেখ ও কথাটা আমাদের কারুর মনেই ছিল না যে, এক বোন থাকতে আর এক বোনকে নিকে করা যায় না। সত্যিই মেজোবউ, তোর-না জানা কিছু নেই দেখছি। আমাদের হাফেজ সাহেব হার মেনে যায় তোর কাছে।” বলেই মেজোবউ কোন দিন কোন বিষয়ে কী ফতোয়া দিয়েছিল, তারই সালংকার বর্ণনা শুরু করে দিলে।

তার শাশুড়ির কিন্তু সন্দেহ আর ঘোচে না। সে কান্না থামিয়ে বলে উঠল, “তুই থাম বড়োবউ, অমন এনেক দেখেছি। কত জনা আমাদের চোখের সামনে এক বোনকে তালাক দিয়ে আর এক বোন কে নিকে করল। ও মুখপোড়া মিনসের মেজোবউয়ের বড়ো বোনকে তালাক দিতে কতক্ষণ?” বলেই কান্নার জের চালায়।

মেজোবউয়ের খোকাটি রোজকার মতো কান্না থামাতে যায়, “দাদি গো, চুপ কর।” মেজোবউ ছেলেকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। বলে, “তোর বাবা-কেলে দাদি! পোড়ামুখো! সব তাতেই ফফর দালালি।”

খোকা ছেলেবেলা ঝেকেই দাদি-ন্যাওটা! যত খায়, তত বলে, “ও দাদি গো, আমায় মেরে ফেললে।”

বৃদ্ধা বউয়ের কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে মেজোবউয়ের বাপ-মাকে গাল দিতে থাকে! তারপর আঁচল দিয়ে খোকার চোখ মুঝিয়ে দিতে দিতে বলে, “দেখ বড়োবউ, সোভান ঠিক এমনটি দেখতে ছিল, ছেলেবেলায় ঠিক এমনি করে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদত! ঠিক তেমনি আওয়াজ।”

বড়োবউ বলে, “ওর কপালের ওইখেনটা কিন্তু ওর বড়ো চাচার মতো, লয় মেজোবউ?”

মেজোবউ কথা কয় না। দাওয়ায় বসে আনমনে পা দোলায় আর চাপাসুরে গান করে।

সেজোবউ পাশ ফিরে কাশতে থাকে। মনে হয়, ওর প্রাণ গলায় ঠেকেছে এসে। কবর দেবার জন্য বাঁশ কাটার শব্দটা যেমন ভীষণ করুণ শোনায়, তেমনই তার কাশির শব্দ।

তার পাশে শিশু আর কাঁদতেও পারে না, কেবল ধুঁকতে থাকে। যেন মৃত্যুর পাখার শব্দ।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে ঘরে এসে বললে, “ওগো, তোমাদের বাড়িতে পাদরি সায়েব আর মেম আসছে!” বাড়িসুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! সত্যি-সত্যিই একজন পাদরি সায়েব, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। বউ-ঝিরা ঘরে ঢুকে পড়ল। শুধু প্যাঁকালের মা হতভম্বের মতো চেয়ে রইল সায়েবের মুখের দিকে।

সায়েব বাংলা ভালোই বলতে পারে। বললে, “টোমরা ভয় করবে না। হামি টোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাডের কে পীরিট আছে, টাহাকে ঔষড ডিবে!”

প্যাঁকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতা আমতা করে বললে, “খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব। ওই আমার বউ আর তার খোকা শুয়ে । দেখো, যদি ভালো করতে পার । কেনা হয়ে থাকব তাহলে?”

সায়েব খুশি হয়ে বললে, “কোনো চিনটা নাই। জিশু বালো করিয়ে ডেবে। জিশুকে প্রারঠনা করো।” তারপর এগিয়ে মাটিতেইতে বসে পড়ে শিশুকে পরীক্ষা করতে লাগল। সাহেব একজন ভালো ডাক্তার।

নার্সকে ইংরেজিতে কী ইঙ্গিত করে সায়েব বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। মুখ তার বিষণ্ন গম্ভীর।

নার্স সেজোবউকে পরীক্ষা করতে লাগল। নার্সের পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বলা-কওয়া করলে কীসব। তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ওষুধ দিয়ে খাওয়াবার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, আবার এসে দেখে যাবে বিকালে।

প্যাঁকালের মা খুশিতে প্রায় কেঁদে ফেললে। বললে, "ছুঁড়ির কপাল ভালো মেজোবউ, এত ওষুধ খেয়েও কি আর মরে? হেদে দেখ, কতকগুলোন ওষুধ দিয়েছে।"

মেজোবউ বললে, "মেম সায়েব যাওয়ার বেলায় একটা টাকা দিয়ে গেছে সেজোবউয়ের পথ্যি কিনতে। বলেছে, বেদানার রস খাওয়াতে। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল। মেজোবউ কাঁদতে লাগল, "কপালে এত দুখ্যুও লিখেছিলেন আল্লা। সেজোবউয়ের যাওয়ার সময়ও ঘরের পয়সায় কিনে দুটো আঙুর কি একটা বেদনা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গোঁয়াতকুটুমের মুখে। সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়!"

শাশুড়ি জেঁদে বলে, "যা বলেছিস মা!"

মৃত্যুক্ষুধা - ১০

সেদিন রবিবার। ছুটি।

প্যাঁকলের গোটা দুয়েকের সময় স্নান করতে বেরুল।

বেরুবার আগে তেলের শূন্য শিশিরটা অনেকক্ষণ ধরে উলটে রাখলে হাতের তালুর উপর। মিনিট পাঁচেকে ফোঁটা পাঁচেক তেল পড়ল। তেল ঠিক নয়, তেলের কাই। শিশিটার পিছন দিকে গোটা দুত্তিন থাপ্পড় মেরেও যখন আর এক ফোঁটার বেশি তেল গড়াল না, তখন তাই কোনোরকমে মুখে হাতে মাখতে মাখতে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ওই তেলটুকু মাথায় সে দিলে না, - নিজের মাথাকে তেলামাথা মনে করেই কিনা - বিশ্ব-সংসারে তেলামাথায় তেল দেওয়ার সবচেয়ে বড়ো মালিক যিনি তিনিই জানেন।

গামছা তাকে বলা যায় না - একটা তেলচিটে ন্যাকড়া, তাই সে মাথায় জড়িয়ে নিলে শৌখিন বাবুদের মাথায় রুমাল বাঁধার মতো করে। তাতে তার কপালে দুঃখটুকু ছাড়া মাথার বাকি সবটুকুই কোনোরকমে ঢাকা পড়ল!

এই সৌভাগ্যের জয়ধ্বজা মাথায় বেঁধে প্যাঁকালে স্নান করতে চলল ক্রিশ্চান পাড়ার ভিতর দিয়ে। মোংলা পুকুরই তার কাছে হয়, কিন্তু কেন যে সে অতটা ঘুরে গোলপুকুরে নাইতে যায়, তা আর লুকা-ছাপা নেই - ও পুকুরে নাইতে যারা যায় তাদের কাছে। প্রেমের পথ সোজা নয় বলেই হয়তো সোজা পথে যায় না।

লোকে বলে মাথার জয়ধ্বজা তার মধু ঘরামির অর্ধেক রাজত্বের ওপর দাবি বসাবার জন্য নয়, তার 'রাজকন্যা'কুর্শিকে জয় করার জন্যই। কিন্তু ওই জয়ধ্বজার

অসম্মানে সে নিজেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে – যখন কুর্শির সামনেই ওই জয়ধ্বজা দিয়ে গা রগড়াতে হয়।

নাইতে গেলে সে কুর্শিদের ঘরের সামনে দিয়েই যায়। আজও যাচ্ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরে আগড়-দেওয়া দেখে বসে পড়ল – রাস্তায় নয়-রোতো কামারের দোকানে।

রোতো তার হাপর ঠেলতে ঠেলতে তাকে একবার আড় নয়নে দেখে নিলে। মনে হল, লোহা পেটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হাসি গোপন করছে।

প্যাঁকালে রোতোর চেয়েও বেশি ঘামতে লাগল, আগুন হতে অনেক দূরে থেকেও।

রোতো নেহাই-এর উপর একটা জ্বলন্ত লোহার ফাল রেখে প্যাঁকালের দিকে চেয়ে বললে, “দেখেছিস মাইরি, আগুন নিয়ে খেলার ঠেলা! হাতের কতটা পুড়ে গিয়েছে দ্যাখ!” বলেই প্রাণপণে হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটায় আর হাসে। প্যাঁকালে বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

রোতো ফলাটা আবার আগুনে সেঁদিয়ে হাপর ঠেলতে ঠেলতে বলে, “মেয়েমানুষ আর আগুন – এই দু-ই সমান বুঝলি, দু-টাতেই হাত পোড়ে।”

এতক্ষণ কুর্শি কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সে-ই জানে; হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “মুখও পোড়ে রে মুখপোড়া।”

প্যাঁকালে তাড়াতাড়ি উঠে পুকুরের দিকে চলে গেল। তখনও রোতার স্বর শোনা যাচ্ছিল, “উ-ই প্যাঁকালে রে! তুই একটু আমার হাপরটা ঠেল ভাই, আমি একটু জলে ডুবে ঠাণ্ডা হসে আসি!”

কুর্শি কতকগুলো সাজি-মাটি-সেদ্ধ কাপড়ের বোঝা নিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে একবার টেরা চাউনি দিয়ে অভ্যর্থনা করে গেল রোতোকে। যাবার সময়

বলেও গেল, "যাসনে মিনসে, এক্কেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবি। জলে ডুবলে আর উঠতে হবে না।"

রোতো হয়তো তখন মনে মনে বলছিল, এ আগুনের তাতে মরার চেয়েও শীতল জলে ডুবে মরায় ঢের আরাম।

রোতোর কিন্তু হাতই পুড়েছে, কপাল পোড়েনি। কুর্শি তাকে দেখতে না পারলেও ঘেন্না করে না।

গোলপুকুরে অন্য যারা চান করে, তাদের কেউই এ অসময়ে – বেলা দুটোয় চান করতে আসে না। কাজেই এই সময়টাই তাদের পক্ষে প্রশস্ত, যারা শুধু গা ধুতেই আসে না, প্রাণ জুড়াতেও আসে।

কুর্শি এসে দেখে, প্যাঁকালে তখন ঘাটের বটগাছটার শিকড়ের উপর বসে সিগারেট টানছে। প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারে ইয়ার বাবুদের কাছে দু-একটা সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই খায় না। আজও স্নান করতে আসার সময় কালকে চাওয়া সিগারেটটা কোঁচড়ে গুঁজে আনতে ভোলেনি।

কুর্শি প্যাঁকালের দিকে না চেয়েই ঘাটে ধপাস করে কাপড়ের রাশ আর পিঁড়িটা ফেলে বেশ করে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিলে। তারপর কারুর দিকে না চেয়ে জোরে জোরেই বলতে লাগল, "ঘাটের মড়া! রোজ রোজ আমার পেছনে লাগবে! দেব একদিন মুখে বাসি চুলোর ছাই ঢেলে, তখন বুঝবে মজাটা!"

প্যাঁকাল আর চুপ করে থাকতে পারলে না। এ উত্তরে হাওয়া তার দিকে না রোতোর দিকে বইছে, তাও সে বুঝতে পারল না। সে ফস করে নেমে এসে পাশের ঘাটের পচা খেজুর গুঁড়িটাতে বসে একটা খোলামকুঁচি নিয়ে পায়ের মরা মাস ঘষতে ঘষতে বললে, "তুই আজ রাগ করেছিস না কি কুর্শি? দেখছিসই তো শালারা কীরকম চোখ লাগাতে শুরু করেছে!"

কুর্শি একটা কাপড় একটু ভিজিয়ে কাচবার জন্য দাঁড়িয়ে বলে, “বয়ে গেছে আমার! এখন তোর কুর্শিকে না হলেও চলবে। তোর ওই মেজোভাবি তো আমার মতন কালো নয়। তা হোক না ছেলের মা।”

এইবার প্যাঁকালে হাওয়ার কতকটা দিক নির্ণয় করতে পারলে। সে পা ঘষা থামিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম, আমি ও নিকে করছিনে। আমাকে কয়েছিলো মা, তা আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন। আমি বলেছি, এ শালার গোয়াড়িতেই থাকব না। রানাঘাট চলে যাব কাজ করতে।”

কুর্শির হাতের কাপড় জলে পড়ে গেল। সে ম্লান করে বললে, “সত্যি চলে যাবি নাকি?”

ওষুধ ধরেছে দেখে প্যাঁকালে খুশি হয়ে বলে উঠল, “যাবই তো! তা না হলে যদি মেজোভাবির সঙ্গে নিকে দিয়ে দেয় ধরে?”

কুর্শি কাপড়টা তুলে অনেকক্ষণ ধরে কাচে। প্যাঁকালে তার কাপড় কাচার বিচিত্র গতিভঙ্গি চোখ পুরে দেখে। চোখে তার ক্ষুধা আর মোহ নেশার মতো করে জমাট বেধেঁ ওঠে! বুকের স্পদন দ্রুত হতে দ্রুততর হতে থাকে।তার যেন নিজেরই নিজেকে ভয় করে। অকারণে পুকুরের চারপাশে ভীত-ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখে –সে যেন কী চুরি করছে। মাথায় তার খুন চড়ে যায়। সে উঠে গিয়ে কুর্শির হাত চেপে ধরে। পা তার ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে। চোখে কীসের শিখা লকলক করে ওঠে। সে শুষ্ককণ্ঠে ডাকে, ‘কুর্শি!’

কুর্শি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, “যা মাইরি, এখুনি কেউ দেখে ফেলবে। একটু হুঁশ নেই! – আগে বল, তুই রানাঘাটে চলে যাবিনে।”

প্যাঁকালে সাহস পেয়ে বলে, “এই দেখ মজিদের দিকে মুখ করে বলছি, আল্লার কিরে কুর্শি, আমি যাব না কোথাও তুই না বললে।”

কুর্শি খুশি হয়ে বলে, “উহু! আমার গা ছুঁয়ে বল!”

প্যাঁকালে গা ছুঁয়ে বলে, “মজিদের চেয়েও বুঝি তুই বড়ো হলি?”

কুর্শি খুব মিষ্টি করে হাসে। বলে, “হলুমই তো।” সে হাসিতে রাজাবাদশা বিকিয়ে যায়। প্যাঁকালে থাকতে না পেরে একটা অতি বড়ো দুঃসাহসের কাজ করে বসে।

কুর্শি খুশি হয়, রাগও করে। মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলে, “যা, ভালো লাগে না, কেউ দেখে ফেলবে এখনই।”

প্যাঁকালেও জানে, যে কোনো লোক যে কোনো সময়ে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ওই হাসি! ওই চোখ! ওই ঠোঁট! ওই দেহের দোলান। দেখুকই না লোকেরা ! প্যাঁকালে যেন মাতাল হয়ে পড়ে। হুঁশ থাকে না।

স্নান করে সে বাড়ি ফেরে। সারা শরীর তার ঝিম ঝিম করতে থাকে। যেন তাড়ি খেয়েছে। মাথার দু পাশের রগ টিপটিপ করে। বিশ্ব-সংসার মুছে যায় তার চোখের সামনে থেকে। সে কেবল ভীত মিষ্টি কণ্ঠের আকুলতা শোনে আর শোনে, “কেউ দেখে ফেলবে, দেখে ফেলবে!” –তার তাকে লজ্জা নাই, লজ্জা শুধু দেখে ফেলার লোককে।

ওদের লজ্জা যেন ওদের জন্য নয়, অন্যের জন্য।

তারা দুজনে চলে – চির-চলা রক্ত-রাঙা পথে। যে-পথ ফরহাদ-মজনুঁ, লায়লি-শিরি, গোলে-বকৌলি, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক, আরও কতজনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে আছে। চির-যৌবনের চির-কণ্টকাকীর্ণ পথ। চিরকালের রোমিও-জুলিয়েট দুষ্মন্ত-শকুন্তলা যেন ওরা!

মৃত্যুক্ষুধা - ১১

"ঝড় আসে নিমেষের ভুলে।"

জীবনের কোন পথ দিয়ে কখন বিপর্যয় আসে, মুহূর্তের জন্যে - নিমেষে সব ওলট-পালট করে দিয়ে যায় -বন্ধনের দড়াদড়ি কখন যায় টুটে, -কেউ জানে না।

এক দিঘি ফোটা পদ্মবনের উপর দিয়ে - ঝড় নয় - শুধু একটা ঘূর্ণি হাওয়ার চলে-যাওয়া দেখেছিলাম। সেই অসহায় পদ্ম-দিঘির ,স্মৃতি আজও ভুলিনি। হয়তো কখনও ভুলবও না। জলের ঢেউ তার তেমনই রইল - কিন্তু পদ্মবন গেল আগাগোড়া ওলট-পালট হয়ে! কোথায় গেল রাঙা শতদলের সে শোভা, কোথায় উড়ে গেল তার পাশের মরাল-মরালী! শুধু কাঁটা-ভরা মৃণাল আর পদ্মের ছিন্নপত্র। ছিন্নদল পদ্মের পাপড়িতে দিঘির মুখ আর দেখাই যায় না।

ও যেন মূর্ছিতা ত্রস্তকুন্তলা বিস্রস্ত-বসনা অভিমানিনী! ওকে কে যেন দু পায়ে দলে পিষে চলে গেছে।

নিমেষের ঝড়।...

ঘরে কাঁদে মেজোবউ, বাইরে কাঁদে কুর্শি। একজন ঘৃণায়, রাগে -আর একজন অভিমানে, বেদনার অসহায় পীড়নে।

প্যাঁকালে কোথায় চলে গেছে।

মেজোবউ রাগে নিজের হাত নিজে কামড়ে মরে নিষ্ফল আক্রোশে। এই আবার পুরুষ, বেটাচেলে! এত বড়ো মিথ্যার ভরকে সে উপেক্ষা করে চলতে পারল না! যে মিথ্যা-কলঙ্কের ঢিল লোকে তাদের ছুঁড়ে মারলে, সেই ঢিল কুড়িয়ে সে তাদের ছুঁড়ে মারতে পারলে না। অন্তত অবহেলায় হাসি হেসে বুক চিতিয়ে তাদেরই সামনে দিয়ে পথ চলতে পারল না। শেষে কিনা পালিয়ে গেল! হার মেনে! কাপুরুষ!

মেজোবউ ভাবে, আর কী একটা সংকল্প করে। অমন সুন্দর মুখ পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে ওঠে।

পুরুষ যেখানে হার পালিয়ে গেল, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করবে তবু হটবে না।

শাশুড়ি কাঁদে, বড়োবউ হা-হুতাশ করে, ছেলেমেয়েরা রোজ সাঁঝে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। এমনই সন্ধে হব-হব সময় সে আসত ওই শিশুগুলির জন্যে একটা-না একটা কিছু নিয়ে!’ কোনোদিন ‘লেবেঞ্চুস’কোনদিন বা বোয়াল মাছ।

মেজোবউয়ের আনমনা ছেলেটি আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তারপর আপন মনেই বলে, “তোমায় কিছু আনতে হবে না ছোটো কাকা, তুমি অমনি এসো।” মাকে বলে, “আচ্ছা মা, ছোটো-চা বুঝি বা-জানের কাছে চলে গিয়েছে? উখেনে থেকে বুঝি আর ছেড়ে দেয় না?”

মা ছেলেকে বুক চেপে ধরে। বলে, “বালাই! ষাট! উখেনে যাবে কেন? হুই রানাঘাট চলে গেছে টাকা রোজগার করতে।”

শিশু থামে না। বলে, “রানাঘাট বুঝি বা-জান যেখেনে থাকে, তার চেয়েও দূর? না মা?”

মা ছেলেকে ধুলোয় বসিয়ে দিয়ে উঠে যায়।

মসজিদে সন্ধ্যার আজানের শব্দ কান্নার মতো এসে কানে বাজে। ও যেন কেবলই স্মরণ করিয়ে দেয় – বেলা শেষ হয়ে এল, আর সময় নাই!..পথ-মঞ্জিলের যাত্রী সশঙ্কিত হয়ে ওঠে!

সন্ধ্যার নামাজ-যেন মৃত দিবসের জানাজা সামনে রেখে তার আত্মার শেষ কল্যাণ-কামনা!

মেজো'বউ পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মসজিদের সিঁড়ির ওপর –'সেজদা'তো নয় –উপুড় হয়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকে। চোখের জলে সিঁড়ির ধুলো পঙ্কিল হয়ে ওঠে –তার ললাটে তারই ছাপ এঁকে দেয়।

কী প্রার্থনা করে সে-ই জানে। ভিতর থেকে মউলবি সাহেবের 'তকবির'ধ্বনি ভেসে আসে, 'আল্লাহো আকবর!'মেজোবউ সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে বলে, 'আল্লাহো আকবর!'কান্নায় গলার কাছে আটকে যায় স্বর।

তারপর ঘরে এসে সব ছেলেমেয়েদের চুমু খায়, আদর করে – অভিভূতের মতো। নিবিড় সান্ত্বনায় বুক ভরে ওঠে। মন কেবলই বলে, এবার আল্লা মুখ তুলে চাইবেন।

শাশুড়িকে ডেকে বলে, "মা আমি কাল থেকে নামাজ পড়ব।"

শাশুড়ি খুশি হয়ে বলে, "লক্ষ্মী মা আমার, পড়বি তো? আর কেউ নয় মা, শুধু তুই যদি খোদার কাছে হাত পেতে চাস খোদা আমাদের এই দুখ্যু রাখবে না – আমার প্যাঁকালে ফিরে আসবে। কই, এতদিন তো পড়ছি নামাজ, এত ডাকলাম, সে শুনল কই মা! কিন্তু তুই ডাকলে শুনবে!"

মেজবউ খুশি হয়ে গান করে – অস্ফুট স্বরে।

শাশুড়ি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "মা, তুই ওই গান ছেড়ে দে দিকিন! ওতে আল্লা ব্যাজার হন। গান করলে 'গুনা'হয়, শুনিসনি সেদিন মউলবি সায়েবের কাছ থেকে?"

মেজোবউ হেসে বলে, "কিন্তু আমি যে ওতে খুশি হই মা। আমি খুশি হলে কি তিনি খুশি হন না? আচ্ছা মা, তুমি মউলবি সায়েবকে জিজ্ঞেস কর তো, গান করে তাঁকে ডাকলে, তাঁর কাছে কাঁদলে কি তিনি তা শোনেন না?

বড়োবউ মুখ গম্ভীর করে বলে, "কোরান পড়ে না ডাকলে আল্লা কি শোনে রে মেজোবউ?"

মেজোবউ হেসে ফেলে। তারপর আপন মনে আবার গুন গুন করে গান ধরে।

প্যাঁকালে যেদিন গভীর রাত্তিরে কাউকে কিছু না বলে চলে যায় –সেদিন বিকেল পর্যন্তও সে জানত না যে চলে যাবে।

সন্ধ্যায় সে ফিরছিল কাজ করে। সারাদিনের ক্লান্ত চরণ তার কখন যে তাকে টেনে কুর্শির বাড়ির সামনে নিয়ে এসেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হয়ে দেখলে বেড়ার ওধারে কুর্শি, এধারে রোতো কামার। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল পাশের আমগাছটার আড়ালে। রোতোর কী একটা কথার উত্তরে কুর্শি কচার একটা ছোট্ট কচি শাখা ভেঙে রোতোকে ছুঁড়ে মারলে, রোতোও হেসে হাতের একটা পান ছুঁড়ে মারলে কুর্শির বুক লক্ষ করে।

রোতোর হাত-যশ আছে বলতে হবে। পানটা কুর্শির বুকেই গিয়ে পড়ল। কুর্শি নিমেষে সেটাকে লুফে নিয়ে মুখ পুরে দিলে।

কিন্তু এরই মধ্যে চক্ষের পলকে কী যেন বিপর্যয় হয়ে গেল।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা কন্নিক এসে লাগল কুর্শির বাম কানের ওপরে, ঠিক কপালের পাশে। কুর্শি 'মাগো' বলে মাটিতে পড়ল। ফিনিক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

এর পর রোতোর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

কুর্শি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। প্যাঁকালে কুর্শিকে পাথালি কোলে করে –যেমন করে বর তার রাঙা নববধূকে বাসি-বিয়ের দিন একঘর হতে আর এক ঘরে নিয়ে যায় তেমনই করে – বুকে জড়িয়ে তাদের বারান্দায় নিয়ে এল। বাড়ির সকলে তখন বেরিয়ে গেছে কোথায় যেন।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর কুর্শি চোখ মেলে চাইল। চেয়েই প্যাঁকালেকে দেখে আবার চক্ষু বুঁজে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেঁদে উঠল, ‘মাগো!’

প্যাঁকালে তার কোল থেকে কুর্শির মাথাটা একটা বালিশের ওপর রেখে উঠতে উঠতে বলল, “তোর বাবাকে বলিস আমি মেরেছি তোকে!” বলেই বেরিয়ে গেল– কুর্শির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার পশ্চাতে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন ঘুম হতে উঠেই কুর্শি শুনলে, প্যাঁকালে চলে গেছে – ওদের বাড়িতে মরাকান্না পড়ে গেছে! শুনেই সে আবার মূর্ছিতা হয়ে পড়ল!

কোথায় কী করে লাগল হাজার চেষ্টা করেও কুর্শির বাবা-মা জানতে পারলে না। কুর্শি কিছু বলে না, কেবল কাঁদে আর মূর্ছা যায়। কিন্তু সেরে উঠতে তার খুব বেশি দিন লাগল না।

মাথার আঘাত তার যত শুকাতে লাগল, ততই তার মনে হতে লাগল, যেন ওই কন্নিকের ঘা বুকে গিয়ে বেজেছে। সে রোজ দিন গোনে আর ভাবে, আজ সে আসবেই। তার গা ছুঁয়ে দিব্যি করল যে দুদিন আগে রাগের মাথায় সে চলেই যদি যায়, তাহলেও তার ফিরতে দেরি হবে না। এ অহংকার তার আছে। আর রোতোর কথা? অমন বাজে ইয়ার্কি জোয়ান বয়সের ছেলে-মেয়ের দেখাশুনা হলেই দুটো হয়। আ মরণ! এ মিনসেকে বুঝি সে ভালোবাসতে গেল?

তারপরেই লুটিয়ে পড়ে কাঁদে! বলে, “ফিরে আয় তুই, ফিরে আয়! তোরই দিব্যি করে বলছি, ওর সঙ্গে দুটো ইয়ার্কি দেওয়া ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধ নাই আমার! ওকে আমি এতটুকুও ভালোবাসিনে!” আরও কত কী! ছেলেমানুষের মতো যা মুখে আসে, তাই বলে যায় আর কাঁদে।

কিন্তু বেশি দিন এমন করে যায় না। ফুল ফোটে, শুকায়, ঝরে পড়ে। হৃদয়ও ফোটে, শুকায়, তারপর দলিত হয় তারই পায়ে –যাকে সে কোনো দিনই চায়নি।

একমাস – দুমাস –তিন মাস যায়, প্যাঁকালে আর আসে না। তবে, খবর পাওয়া গেছে যে, সে কোলকাতায় কাজ করছে – রাজমিস্ত্রিরই কাজ। দুবার টাকাও পাঠিয়েছে বাড়িতে।

কুর্শি একদিন মরিয়া হয়ে প্যাঁকালের বড়ো-ভাবিকে জিজ্ঞেস করল – সে কখন আসবে এবং চিঠিপত্র দেয় কি-না। বড়োবউ মুখ বেঁকিয়ে বললে, “কে জানে কখন আসবে!” কিন্তু এ খবরটা জানা গেল যে, চিঠিপত্তর মাঝে মাঝে দেয় বাড়িতে।

কুর্শি আর শুনতে পারল না, মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

কিন্তু কীসের জন্য তার এত ক্ষোভ, তা সে নিজেই বুঝে না। কেবল অসহায়ের মতো ছটফট করে মরে। চিঠি সে যে কেমন করে দেবে তাকে তা সে নিজেই ভেবে উঠতে পারে না। তবু রোজ মনে করে, বুঝি তার নামে আজ চিঠি আসবে। ক্রিশ্চান মেয়ে সে, মোটামুটি লেখাপড়া জানে, একটা চিঠিও হাতে কোনরকমে লিখতে পারে। মাঝে মাঝে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসেও লিখতে। কিন্তু লিখেই তার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, মন যেন কেন বিষিয়ে ওঠে নিবিড় অভিমানে। লেখা কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে!

মাঝে মাঝে ভাবে, খুব কঠিন হয়ে থাকলে বুঝি সে না এসে পারবে না। তারপর দুদিন তিনদিন মুখ ভার করে থাকে, রাস্তায় বেরোয়, গোলপুকুরে নাইতে যায় মুখ ভার করেই-সেখানে তিনটে বেজে যায়, কেউ আসে না। প্যাঁকালেদের ঘরের সামনে দিয়ে আসে যায়, এখন আর কেউ ফিরেও দেখে না। শুধু মেজোবউ তাকে দেখতে পেলে মুখ টিপে হাসে আর গান করে। কুর্শির শরীর-মন যেন রি-রি-রি-রি করতে থাকে রাগে।

এতদিন তার সয়েছিল এই ভেবে যে, হাজার হোক সে-ই তো অপরাধী। অমন করে পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে কার না রাগ হয়! ভাবতেই জিভ কেটে লজ্জায় সে যেন মরে যায়! সেও তো পর-পুরুষ! রোতো যেমন সেও তো তেমনই! বিয়ে তাদের হয়নি, হতেও পারে না। তবু, মন তার এমনই অবুঝ যে,

সে কেবলই কীসব অসম্ভব দাবি করে বসে তারই ওপর –বাইরের দিক থেকে যার ওপর কোনো দাবিই সে করতে পারে না।

কিন্তু যত বড়োই অপরাধ সে করুক, তারই গা ছুঁয়ে তো সে দিব্যি করে বলেছিল যে, তাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। সে না-হয় কিছু না-ই হল, মজিদের দিকে মুখ করে দিব্যি করেছিল! এত বড়ো কী অপরাধ করেছে সে যে, প্যাঁকালে মজিদেরও অপমান করতে সাহস করে সেই অপরাধের জ্বালায়!

মন তার বেদনায় নিষ্ফল ক্রন্দনে ফেনিয়ে ওঠে। যত মন জ্বালা করে, তত বুক ব্যথা করে। সে বুঝি আর পারে না! রবিবার গির্জায় গিয়ে কাতরস্বরে প্রার্থনা করে, “জিশু, তুমি আমায় খুব বড়ো একটা অসুখ দাও, যেন শুনে সে ছুটে আসতে রাস্তা পায় না।”

শুকিয়ে সে যেতে লাগল দিন দিন, কিন্তু বড়ো কিছু অসুখও হল না। প্যাঁকালেওএল না! কুর্শি এইবার যেন মরিয়া হয়ে উঠল। এইবার সে-যা হোক একটা কিছু করবে। এইবার সে দেখিয়ে দেবে যে, খেরেস্তান হলেও সে মানুষ। তাকে ছুঁয়ে দিব্যি করে যে সেই দিব্যির অপমান করে, তাকে সেও অপমান করতে জানে!

সে ইচ্ছা করেই রোতো কামারের দোকানের সামনে দিয়ে একটু বেশি করে যাওয়া আসা করতে লাগল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে রোতো কিন্তু অতিমাত্রায় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এখন দিনরাত দোকানে বসে লোহা পেটে আর হাপর ঠেলে। কুর্শিকে দেখলে সে যেন এতটুকু হয়ে যায় – লজ্জায়, ভয়ে। কীসের এত লজ্জা, এত ভয় ওইটুকু মেয়েকে সে খুব ভালো করে যে বোঝে, তা নয়। কী যেন মস্ত বড়ো অপরাধের বোঝা জোর করে তার মাথাটা ধরে নিচু করে দেয়। কুর্শি তার পাশ দিয়ে হাঁটে, আর অমনি সে প্রাণপণ জোরে হাপর ঠেলতে থাকে। যেন সমস্ত বিশ্বটাকে সে-ই চালাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে জলন্ত লোহাটাকে নেহাই-এর ওপর রেখে পটতে থাকে। আগুনের ফুলকিতে তার মুখ আর দেখা যায় না।

সেদিন হঠাৎ কুর্শি তার একেবারেই চোখের সামনে এসে পড়ল। সে কিন্তু হেসে উঠল, "আ মর ড্যাকরা! যেন চেনেনেই না আমায়! তোর হল কী বল তো!"

রোতো ঘেমে উঠে ভীত চোখের দৃষ্টিতে চারিদিকে চায়, তারপর আস্তে আস্তে বলে, "না ভাই, আর কাজ নেই। সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুক আজও দুরুদুরু করে ওঠে!...শালা ডাকাত!..সে আবার আসছে কখন?"

কুর্শি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "আর সে আসছে না। এলে টের পাইবে দেব মজাটা এইবার!"

রোতো কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। আমতা আমতা করে বলে, "আমি ইচ্ছে করলে শালাকে সেদিন গুঁড়িয়ে দিতে পারতুম, শুধু তোর জন্যেই দিইনি।"

কুর্শি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "মাইরি বলছিস, তুই তাকে মারতে পারবি এবার এলে? ওই কচার বেড়ায় ধারে -- যেখেনে সে আমায় কন্নিক ছুঁড়ে মেরেছিল, ওইখেনে ওকে মেরে শুইয়ে দিতে পারবি?" উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে।

তার আন্দোলিত বুকের পানে তাকিয়ে রোতের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সে হঠাৎ কুর্শি হাত চেপে ধরে এসে। বলে, "এই তোকে ছুঁয়ে বলে রাখলাম কুর্শি, ওকে যদি ওইখেনে মেরে শুইয়ে না দিই, তবে আমি বাপের বেটা নই! একবার এলে হল শালা!"

কুর্শি ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, "মর হতচ্ছাড়া! বড়ো যে আস্পর্ধা তোর দেখছি! আমার হাত ধরেন এসে! একবার মেরেই দেখিস, পিঠের ওপর খ্যাংরার বাড়ি কেমন মিষ্টি লাগে!" সে আর বলতে পারে না; কান্নায় তার বুক যেন ভেঙে যায়! তারপর, দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসে – তাদের গির্জার কালো পোশাক-পরা মিসবাবাদের মতো!

মৃত্যুক্ষুধা - ১২

একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা।

সেজোবউ আর তার ছেলেকে বাঁচাতে পারা গেল না। ওর শুশ্রূষা যেটুকু করেছিল সে শুধু ওই মেজোবউ আর ওষুধ দিয়েছিল মেম সায়েব - রোমান ক্যাথলিক মিশনারি।

মেজোবউ সেজোর রোগ-শিয়রে সারারাত জেগে বসে থাকে। কেরোসিনের ডিবে ধোঁয়া উদগিরণ করে ক্লান্ত হয়ে নিবে যায়। অন্ধকারে বন্ধুর মতো জাগে একা মেজোবউ। আর পাথরের মতো স্থির হয়ে দেখে, কেমন করে একজন মানুষ আর একজন অসহায় মানুষের চোখের সামনে ফুরিয়ে আসে।

সেজোবউ তার ললাটে মেজোবউয়ের তপ্ত হাতের স্পর্শ-ছোঁয়ায় চকিত হয়ে চোখ খোলে। বলে, "এসেছ তুমি?" তারপর শিয়রে মেজোবউকে দেখে ক্ষীণ হাসি হেসে বলে, "মেজো-বু, তুমি বুঝি? তোমার সব ঘুম বুঝি আমার চোখে ঢেলে দিয়েছ?"

মেজোবউ নত হয়ে সেজোর চোখে চুমু খায়। সেজো মেজোবউয়ের হাতটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলে, "মেজো-বু, তুমি কাঁদছ?" –তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে, "কাঁদো মেজো-বু, মরার সময়েও তবু একটু দেখে যাই, এই পোড়ামুখির জন্যেও কেউ কাঁদছে। দেখো মেজো-বু, তুমি আমার জন্য কাঁদছ, আর তাই দেখে আমার এত ভালো লাগছে - সে আর কি বলব। ইচ্ছে করছে বাড়ির সব্বাই যদি আমার কাছে বসে এমনই করে কাঁদে, আমি তাহলে হেসে মরতে পারি। হয়তো বা বেঁচেও যেতে পারি। কিন্তু মেজো-বু, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এই ছেলের ভাবনা? ওর মায়া কাটিয়েছি! কাল ওর বাবাকে দেখেছিলুম 'খোয়াবে', বললে, 'খোকাকে নিতে এসেছি।'আমি বললুম, 'আর আমায়?'সে হেসে বললে, 'তোকে নয়।'আমি কেঁদে বললুম, 'যম তো নেবে, তুমি না নাও' ! "

মেজোবউ কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে, “চুপ করে ঘুমো সেজো, তোর পায়ে পড়ি বোনটি!”

সেজো মেজোবউয়ের হাতটা গালের নীচে রেখে পাশ ফিরে শোয়। বলে, “কাল তো আর আসব না মেজো-বু কথা বলতে। ঘুমোব বলেই তো কথা কয়ে নিচ্ছি। এমন ঘুমুব যে, হু -ই ‘গোদা ডাঙায়’গিয়ে রেকে আসবে তিনগাড়ি মাটি চাপা দিয়ে। যেন ভূত হয়েও আর ফিরে আসতে না পারি!.. দেখো মেজো-বু, কাল সে যদি শুধু খোকাকে নিতে আসত, তাহলে কি হাসতে পারত অমন করে? আমায়ও নিয়ে যাবে, ও চিরটাকাল আমার সঙ্গে অমনই দুষ্টুমি করে কথা কয়েছে!...তোমার মনে আছে মেজো-বু, মরার আধঘন্টা আগেও আমায় কেমন করে বললে, ‘আমার সামনে তুই যদি এক্ষুনি মরিস, তাহলে আমার মরতে এত কষ্ট হয় না!...”

শিয়রে প্রদীপ নিবু-নিবু হয়ে আসে। শুধু মেজোবউয়ের চোখ ভোর আকাশের তারার মতো চোখের জলে চিকমিক করে। বলে, “সেজো, তোর কিছু ইচ্ছে করছে এখন?”

সেজো ধীর শান্তস্বরে বলে, “কিচ্ছু না। আর এখন কোনো কিছু পেতে ইচ্ছে করে না মেজো-বু! কাল পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, যদি একটু ভালো খাবার-পথ্যি পেতুম -তাহলে হয়তো বেঁচে যেতুম। খোকার মুখে তার মায়ের দু-ফোঁটা দুধ পড়ত। আর তো পাবে না বাছা আমার!” বলেই ছেলের গালে চুমু খায়।

একটা আঁধার রাত যেন ডাইনির মতো শিস দিয়ে ফেরে। গাছপালা ঘরবাড়ি--সব যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে থাকে। তারাগুলোকে দেখে মনে হয় সহস্র হতভাগিনির শিয়রে নিবু-নিবু পিদিম।

এরই মাঝে মাটির ঘরের মাটির শেজে শুয়ে একটি মানুষ নিবতে থাকে রিক্ত-তৈল মৃৎ-প্রদীপের মতো। তেল ওর ফুরিয়ে গেছে, এখন সলতেতে আগুন ধরেছে। ওটুকুও ছাই হতে আর দেরি নেই।

সেজো মেজোবউয়ের হাতটা বাঁ-বুকে জোরে চেপে বলে, "দেখছ, মেজো-বু, বুকটা কীরকম ধড়ফড় করছে। একটা পাখিকে ধরে খাঁচায় পুরলে সে যেমন ছটফট করে বেরোবার জন্যে, তেমনই, না? উঃ! আমার যেন দম আটকে আসছে! মেজো-বু! বাইরে কি এতটুকুও বাতাস নেই?"

মেজোবউ জোরে জোরে পাখা করে।

সেজো মেজোবউয়ের পাখা-সমেত হাতটা চেপে ধরে, "থাক, থাক! ও বাতাসে কি আর কুলোয় মেজো-বু? সব সইত আমার, সে যদি পাশে বসে থাকত! আমি চলে যাচ্ছি দেখে সে খুব করে কাঁদত, তার চোখের পানিতে আমার মুখ যেত ভেসে!" আর বলতে পারে না। কথা আটকে যায়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়।

খোকা কেঁদে ওঠে। মেজোবউ কোলে নিয়ে দোলা দেয়, ছড়া গায় –"ঘুম আয়োরে নাইলো তলা দিয়া, ছাগল-চোরায় যুক্তি করে খোকনের ঘুম নিয়া। "

ভোরের দিকে সেজোবউ ঢুলে পড়তে লাগল মরণের কোলে। মেজোবউ কাউকে জাগালে না। সেজোর কানে মুখ রেখে কেঁদে বললে, "সেজো! বোনটি আমার! তুই একলাই যা চুপটি করে। তোর যাওয়ার সময় আর মিথ্যে কান্নার দুখ্যু নিয়ে যাসনে!"

সেজো শুনতে পেলে কিনা, সে-ই জানে। শুধু অস্ফুটস্বরে বললে, "খোকা…তুমি…"

মেজোবউ সেজোর দুই ভুরুর মাঝখানটিতে চুমু খেয়ে বললে, "ওকে আমি নিলাম সেজো, তুই যা তোর বরের কাছে। আর পারিস তো আমায় ডেকে নিস! "

মেজোবউ আর থাকতে পারল না –ডুকরে কেঁদে উঠল।

দূরে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভোরের নামাজের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল –“আসসালাতু খায়রুম মিনান্নৌম। – ওগো জাগো! নিদ্রার চেয়ে উপাসনা ঢের ভালো। জাগো!”

মেজোবউ দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, “অনেক ডেকেছি আল্লা, আজ আর তোমায় ডাকব না।”

সেজোর মুখ কিন্তু কী এক অভিনব আলোকোচ্ছ্বাসে আলোকিত হয়ে উঠল। সে প্রাণপণ বলে দুই হাত তুলে মাথায় ঠেকালে – মুনাজাত করার মতো করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গেল –কিন্তু তা তক্ষুনি ছিন্নলতার মতো এলিয়ে পড়ল তার বুকে।

মেজোবউ মুগ্ধের মতো তার মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের শেষ জ্যোতি দেখলে –তারপর আস্তে আস্তে তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিলে।

প্রভাতের ফুল দুপুরের আগেই ঝরে পড়ল।

মেজোবউ আর চুপ করে থাকতে পারল না। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, “মাগো, তোমরা ওঠো, সেজ নেই…”

প্রভাতের আকাশ-বাতাস হাহাকার করে উঠল – নেই – নেই – নেই!

মৃত্যুক্ষুধা - ১৩

সেজোবউয়ের খোকাকেও আর বাঁচানো গেল না।

মাতৃহারা নীড়-ত্যক্ত বিহগ-শিশু যেমন করে বিশুষ্ক চঞ্চু হাঁ করে ধুঁকতে থাকে, তেমনই করে ধুঁকে- মাতৃস্তন্যে চিরবঞ্চিত শিশু!

মেজোবউয়ের দুচোখে শ্রাবণ রাতের মেঘের মতো বর্ষাধারা নামে। বলে, "সেজোবউ, তুই যেখানেই থাক, নিয়ে যা তোর খোকাকে! আর এ-যন্ত্রণা দেখতে পারিনে!"

খোকা অস্ফুট দীর্ণ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে, 'মা' !

মেজোবউ চুমোয় চুমোয় খোকার মুখ অভিষিক্ত করে দিয়ে বলে, "এই যে জাদু, এই যে সোনা, এই যে আমি!"

বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে এসে কাঁদে। শাবককে সাপে ধরলে বিহগ-মাতা ও তার স্বজাতীয় পাখির দল যেমন অসহায়ের মতো চিৎকার করে, তেমনই।

সাপের মুখের মুমূর্ষু বিহগ-শিশুর মতোই মেজোবউয়ের কোলে মৃত্যমুখী খোকা কাতরায়।

ভোর না হতেই সেজোবউয়ের খোকা সেজোবউয়ের কাছে চলে গেল। শবেবরাত রজনিতে গোরস্থানের মৃৎ-প্রদীপ যেমন ক্ষণেকের তরে ক্ষীণ আলো দিয়ে নিবে যায়, তেমনই।

দুপুর পর্যন্ত একজন-না একজন কেঁদে বাড়িটাকে উত্যক্ত করে তোলে, তারপর গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে। শোকের বাড়ির ক্লান্ত প্রশান্তি, অতল গভীর।

ঘুমায় না শুধু মেজোবউ। তার ছেলেমেয়ে দুটিকে বুকে চেপে দূর আকাশে চেয়ে থাকে। গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রতপ্ত আঁখি!...বাঁশ গাছগুলো তন্দ্রাবেশে ঢুলে ঢুলে পড়ছে। ডোবার ধারে গাছের ছায়ার পাতি-হাঁসগুলো ডানায় মুখ গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। একপাল মুরগি আতা-কাঁঠালের ঝোপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

অদূর বাবুদের শখের বাড়ির বিলিতি তালগাছগুলো সারি সারি চাঁড়িয়ে। তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ – যেন ইমামের পেছনে অনেকগুলো লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে – সামনের শুকানো বাগানটায় জানাজার নামাজ।

এমনই সময় উত্তরের আম বাগানের ছায়া-শীতল পথ দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারির মিস জোন্স প্যাঁকালেদের ঘরে এসে হাজির হল। মিস জোন্স ওদের বিলিতি দেশে যুবতি, আমাদের দেশে 'আধা-বয়েসি'পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি বয়েস। শ্বেতবসনা সুন্দরী। এই মেয়েটিই সেজোবউ আর তার খোকাকে ওষুধ-পথ্য দিয়ে যেত।

সেজোবউ আর তার ছেলেকে যে বাঁচানো যাবে না, তা সে আগেই জানত এবং তা মেজোবউকে আড়ালে ডেকে বলেওছিল। তবু তার যতটুকু সাধ্য, তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

সকালে এসে মেজোবউকে একবার সে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। এই সময়টা বেশ নিরিবিলি বলেই হোক বা মেজোবউয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি-গুণেই হোক, সে আবার এসে মেজোবউয়ের সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলে।

এ কয়দিনে মেজোবউও আর তাকে 'মেম সায়েব'বলে অতিরিক্ত স-সংকোচ শ্রদ্ধার ভাব দেখায় না। তাদের সম্বন্ধ বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

মিস জোন্স বাংলা ভালো বলতে পারলেও সায়েবি টানটা এখনও ভুলতে পারেনি। তবে তার কথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না কারুর।

এ-কথা সে-কথার পর মিস জোন্স হঠাৎ বলে উঠল, “ডেখো, টোমার মটো বুডঢিমটি মেয়ে লেখাপড়া শিখলে অনেক কাজ করটে পারে। টোমাকে ডেকে এট লোভ হয় লেখাপড়া শেখবার।”

মেজোবউ হঠাৎ মেমের মুখের থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, “সত্যি মিসি বাবা! আমারও এত সাধ যায় লেখাপড়া শিখতে! শেখাবে আমায়? আমার আর কিছু ভালো লাগে না ছাই এ বাড়িঘর!”

মিস জোন্স হেসে খুশিতে মেজোবউয়ের হাত চেপে ধরে বলে উঠল, “আজই রাজি। বড়ো ডুখ্খু পাচ্ছো টুমি, মনও খুব খারাব আছে টোমার এখন; এখন লেখাপড়া শিখলে টোমার মন এসব ভুলে ঠাকবে।”

মেজোবউ কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর ম্লানস্বরে বলে উঠল, “আমার ছেলেমেয়েদের কী করব?”

মিস জোন্স হেসে বললে, “আরে, ওডেরেও সঙ্গে নিয়ে যাবে যাওয়ার সময়। ওখানে ওরাও পড়ালেখা করবে, ওডের আমি বিস্কুট ডেবে, খাবার ডেবে, ওরা খুশি হয়ে ঠাকবে।”

মেজোবউ আবার কী ভাবতে লাগল যেন। ভাবতে ভাবতে তার বেদনাম্লান চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এই বাড়িতে যেন তার নাড়ি পোঁতা আছে। দুটো ছেলেমেয়ের বন্ধন, তারাও সাথে যাবে, আর সে চিরকালের জন্যও যাচ্ছে না–তবু কী এক অহেতুক আশঙ্কায় বেদনায় তার প্রাণ যেন টনটন করতে লাগল।

মিস জোন্স সুচতুরা ইংরেজ মেয়ে। সে বলে উঠল, “আমি টোমার মনের কঠা বুজেছে। টোমাকে একেবারে যেটে হবে না সেখানে। ক্রিশ্চানও হটে হবে না। টুমি শুধু রোজ সকালে একবার করে যাবে। আবার ডুপুরে চলে আসবে।”

মেজোবউ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, “তা আমি যেতে পারব মিস-বাবা! পাড়ায় দুদিন একটা গোলমাল হবে হয়তো। তবে তা সয়েও যেতে পারে দু এক দিনে।”

মেজোবউয়ের ছেলেমেয়ে দুটি বিস্কুটের লোভে উসখুস করছিল এবং মনে মনে রাগছিলও এই ভেবে যে, কেন তাদের মা তখনই যাচ্ছে না মিস-বাবার সাথে! কিন্তু মায়ের শিক্ষাগুণে তারা মুখ ফুটে একটি কথাও বললে না। খোকাটি শুধু একবার তার ডাগর চোখ মেলে করুণ নয়নে মিস-বাবার দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে লজ্জায়।

মিস জোন্স খোকাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে তার হাতব্যাগ থেকে চারটে পয়সা বের করে তাদের ভাইবোনের হাতে দুটো করে দিয়ে বললে, “যাও, বিস্কুট কিনে খাবে।”

মেয়েটি পয়সা হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে যেন অনুমতি চাইলে। মেজোবউ হেসে বললে, “যা বিস্কুট কিনে খা গিয়ে।”

মিস জোন্স উঠে পড়ে বললে, “আজ টবে আসি! কাল ঠেকে তুমি সকালেই যাবে কিন্টু!”

মেজোবউ অন্যমনস্কভাবে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

সমস্ত আকাশ তখন তার চোখে ঝাপসা ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে।

পাশের আমগাছে দুটো কোকিল যেন আড়ি করে ডাকতে শুরু করেছে – কু-কু-কু! সে ডাকে সারা পল্লি বিরহ-বিধুরা বধূর মতো আলসে এলিয়ে পড়েছে।

মেজোবউ মাটিতে এলিয়ে পড়ল, নিরাশ্রয় নিরবলম্বন ছিন্ন স্বর্ণহার যেমন করে ধুলায় পড়ে যায়, তেমনই করে।

মৃত্যুক্ষুধা - ১৪

পরদিন সকালে কেউ উঠবার আগেই মেজোবউ তার ছেলেমেয়েকে নিয় মিস জোন্সের কাছে চলে গেল। যাওয়ার আগে শুধু বড়োবউকে চুপি চুপি বলে গেল, "শাশুড়ি বিশেষ পীড়াপীড়ি করলে বাপের বাড়ি গেছি বোলো!" বড়োবউ ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে রইল। মেজোবউ এতটা বাড়াবাড়ি তার ভালো লাগছিল না। তবু সে মেজোবউকে একটু বেশিরকম ভালোবাসে বলেই কিছু না বলে অভিমানে গুম হয়ে রইল। কত বড়ো দুঃখে পড়ে মেজোবউ আজ মিস-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তাও তার অজানা ছিল না। তাই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েই রইল।

দিনকয়েক আগে থেকে তার শাশুড়িও কাঠুরে-পাড়ার সাব-ডেপুটি সাহেবের বাড়িতে চাকুরি নিয়েছিল, তাই সকালে উঠেই সেও চলে গেল, কারুর খোঁজখবর নেওয়ার আর গরজ করলে না। নইলে সকালেই হয়তো একটা কাণ্ড বেধে যেত!

পাড়ার অল্প দূরেই রোম্যান ক্যাথলিক গির্জা-ঘর। মেজোবউ গির্জার দ্বারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন গির্জার ভিতরে খ্রিস্টের স্তব-গান গীত হচ্ছিল সববেত নারী-কণ্ঠে। গানের কথা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না, তার কাছে অপূর্ব মিষ্টি লাগছিল শুধু তার সুর আর প্রকাণ্ড হলে প্রতিধ্বনিত অর্গ্যানের গম্ভীর মধুর আওয়াজ। তার মন শ্রদ্ধায়, খুশিতে ভরে উঠছিল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তারই বাড়ির পাশের মসজিদের আজান-ধ্বনি। তার মন কী এক অব্যক্ত বেদনায় কেবলই আলোড়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার মন যেন কেবলই শাসাতে লাগল, সে পাপ করছে – অতি বড়ো অন্যায় করছে, এর ক্ষমা নাই, এর ফল ভীষণ, তাকে অনন্তকালের জন্য…।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কার ছোঁয়ায় চমকে উঠে দেখল, মিস জোন্স মধুর হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে পিছনে দাঁড়িয়ে। মেজোবউকে ইঙ্গিতে পিছনে আসতে বলে মিস

জোন্স গির্জার পাশের বাড়ির একটা কামরায় গিয়ে ঢুকল। মেজোবউ কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল দেখে মিস জোন্স ভিতর হতে বললে, 'ভিটরে এসো।'মেজোবউ স-সংকোচে ভিতর গিয়ে দেখলে, সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট প্রভৃতি খাবার। মিস জোন্স মেজোবউকে তার বিছানার জোর করে বসিয়ে বললে, "একটু চা খাও আমার সাটে, টারপর কঠা হবে।"

মেজোবউ কিছুতেই রাজি হয় না খেতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর বললে, "মিস-বাবা আমাদের জাত যায় তোমাদের সাথে খেলে।" মিস জোন্স চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বললে, "ও ঘড! আমিও টো টা জানটুম।" বলে মুখ ম্লান করে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "কিন্টু টোমাডের মুসলমান ধর্মের অনেক কিছু আমি জানি, টাটে কারুর সঙ্গে খেটে নিষেড নেই।" মেজোবউ হেসে বলল, "তা তো আমি জানি না, আমাদের মউলবি সায়েব আর মোড়ল তো অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানদের ছোঁয়া খাওয়ার জন্যে।"

মেম সায়েব আর কিছু না বলে মেজোবউয়ের ছেলেমেয়ে দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বিস্কুট হাতে দিয়ে বললে, "এদের আমি চা খাওয়ালে ডোষ হবে না টো?" মেজো-বু হেসে বললে, 'হবে।' মেম সাহেব এইবার একটু জোরের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয় হবে না। ওরা এখনও মুসলমান-ক্রিশ্চান কিছু নয় – ওরা শিশু। "

মেজোবউ চুপ করে রইল। সে তখন অন্য কথা ভাবছিল।

ক্ষুধার্ত শিশু বিস্কুট হাতে করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মেজোবউ অস্ফুটস্বরে বলল, "খা।"

ছেলেমেয়েদের চা খাওয়া হলে মিস জোন্স নিজে চা খেয়ে বললে, "টোমায় জোর করে খাওয়াব না। টবে টুমি কিছু না খেয়ে অমনি রইলে। যাক, টোমাকে ডাকব কী বলে? টোমার নাম টো একটা আছে।"

মেজোবউ হেসে বললে, “নাম একটা ছিল হয়তো বিয়ের আগে। তা এখন ভুলে গিয়েছি। এখন আমি ‘মেজোবউ’ । ”

মিস জোন্স হেসে বললে, “আচ্ছা, আমি টোমায় মেজোবউই বলব।”

বলেই মিস জোন্স কী ভাবলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, “ডেখ মেজোবউ, আমি টোমায় ভালোবেসেছি। কেন টোমায় এট ভালো লাগে জানি না। আমি টোমাকে আপন সিস্টারে মটো করে লেখাপড়া শেখাব।”

মেজোবউয়ের চোখ জলে টলমল করে উঠল।

প্রায় এগারোটার সময় যখন সে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ি ঢুকল আবার এসে, তখন তার শাশুড়ি শিলাবৃষ্টির মেঘের মতো মুখ করে রান্নাঘরের সামনে বসে বোধহয় মেজোবউয়েরই প্রতীক্ষা করছিল।

মেজোবউ কিছু না বলে সোজা ঘরে ঢুকল গিয়ে। শুধু তার খোকা দৌড়ে তার দাদির কোলে উঠে বললে, “বল তো দিদি, কোথায় গিয়েছিলুম।” ভিতর থেকে মেজোবউ চিৎকার করে উঠল, “খোকা, এদিকে আয়!” ছেলে ভয়ে ভয়ে মায়ের কাছে চলে গেল। শাশুড়িও এইবার শতধারে ফেটে পড়ল। ঝড়, বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতোই বেগে চিৎকার, কান্না ও গালি চলতে লাগল। মেজোবউ চুপ করে শুনে যেতে লাগল।

মৃত্যুক্ষুধা - ১৫

চাঁদ-সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লক্ষীছাড়া-মতো চেহারার লম্বা-চওড়া একজন মুসলমান যুবক কোত্থেকে এসে সোজা নাজির সাহেবের বাসায় উঠল। নাজির সাহেব কৃষ্ণনগরে সবে বদলি হয়ে এসে চাঁদ-সড়কেই বাসা নিয়েছেন।

যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেই জামা-কাপড়-কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মতো টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রস। তরবারি-ক্রসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশি ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্ঠি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মতো কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকার মতো এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরসা তেমনি নাক-চোখের গড়ন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে তৈরি -গ্রিক-ভাস্করের অ্যাপোলো মূর্তির মতো - নিখুঁত সুন্দর।

কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মতো কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্চাকৃত অবহেলার, অযত্নের ছাপ। গায়ে মুখে এত ময়লা যে, মনে হয় এই মাত্র ইঞ্জিন চালিয়ে এল। দাড়ি সে রাখে না, কিন্তু বোধহয় হপ্তাখানেক ক্ষৌরি না করার দরুন খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে মুখটা বঁইচিকন্টকাকীর্ণ বাগিচার মতো বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু এ-সবে ওর নিজের কোনোরূপ অসোয়াস্তি হচ্ছে বলে মনে হয় না। সে স্টেশন থেকে পায়দল হেঁটে এসে পিঠের কিটব্যাগটা সশব্দে মাটিতে ফেলে দিয়ে নাজির সাহেবের বাইরের ঘরের ইজি-চেয়ারটাতে এমন আরামের সঙ্গে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, যেন এ তার নিজেরই বাড়ি এবং সে এইমাত্র বাথরুম থেকে 'ফ্রেশ' হয়ে বেরিয়ে আসছে।

তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে এবং নাজির সাহেব তখনও ওঠেননি।

ইজিচেয়ারে শোওয়ার একটু পরেই যুবকের নাক ডাকতে লাগল।

গোটা-আটেকের সময় নাজির সাহেব দহ্‌লিজে এসে যুবক দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন। মনে করলেন, কোনো কাবুলিওয়ালা কাপড়ের গাঁটরি রেখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাজির সাহেব অতিমাত্রায় ভালোমানুষ। কাজেই একজন কাবুলিওয়ালা তাঁর ইজি-চেয়ারে ঘুমোচ্ছে মনে করেও তিনি কিছু না বলে বাড়ির ভিতর চলে গেলেন ; এবং যাতে বেচারার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য তাঁর দুরন্ত ছেলেমেয়ে কটিকে বাইরের ঘরে যেতে নিষেধ করলেন।

ছেলেরা এ খবর জানত না। তার মনে করল, মানা যখন করছে, তখন নিশ্চয়ই কোনো একটা মজার জিনিস এসে থাকবে সেখানে। ওদের দলের সর্দার আমিরের বয়স খুব জোর বছর আটেক হবে। বাকি সব তার জুনিয়র। সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো এক ধাপা করে নীচে।

আমির তার ‘গ্যাং’কে চুপিচুপি কী বললে। সকলের চোখে-মুখে খুশির একটা তীব্র হিল্লোল বয়ে গেল- হঠাৎ বিদুৎ-ঝলসানির মতো। চুনীবিল্লির মতো মুখ করে সকলে বেড়িয়ে গেল। তারপর বাইরের দিক থেকে এসে ঈষৎ দরজা ফাঁক করে দেখতে লাগল। কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে অনেকটা উৎসাহ কমে গেল। ওর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদে যেটি, সে প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, “ওঁ বাঁবাঁ! জুঁ জুঁ!” তার একধাপ উঁচু সিনিয়র ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বললে, “উঁহু, ছেলেধরা, ওই দেখ ঝুলি!” বলেই কিটব্যাগটা দেখিয়ে দিলে। বাস আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গে আমির ছাড়া আর সকলে “মার মার না পগার পার”করে দৌড় দিলে।

আমির কিন্তু হটবার ছেলে নয়। তার উপর সে দলপতি। ভয় যতই করুক, পালিয়ে গেলে তার প্রেস্টিজ থাকে না। কাজেই সে কিছুই না বলে গম্ভীরভাবে একটা লম্বা খড় এনে সোজা নিদ্রিত যুবকটির নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিল; যুবকটি

একেবারে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল। আমিরের স্ফূর্তি দেখে কে! সে তখন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়েছে!

যুবকটি কিছু না বলে পকেট থেকে একটি রিভলবার বের করে আমিরের দিকে লক্ষ করে শট করলে। ভীষণ শব্দে নাজির সাহেব মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে এলেন। আরও অনেক এ ছুটে এল। আমির ভয়ে জড়পিণ্ডবৎ হয়ে গেছে, কান্না পর্যন্ত যেন আসছে না! তার বাবাকে আসতে দেখে সে একেবারে চিৎকার করে তাঁকে জড়িয়ে ধরল গিয়ে। তিনি কিছু বলবার আগেই যুবকটি হাসতে হাসতে তার রিভলবারটা নিয়ে আমিরের হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলতে লাগল, “এটা তোমায় দিলাম।” নাজির সাহেবের দিকে ফিরে বললে, “এটা নকল রিভলবার। এটা দিয়ে অনেক পুলিশকে অনেকবার ঠকিয়েছি।”

নাজির সাহেব ও উপস্থিত সকলে যুবককে উন্মাদ মনে করে হতভম্ব হয়ে তার কার্যকলাপ দেখছিলেন। এইবার অনেকেই হেসে ফেললে। কিন্তু কারুর কিছু বলবার আগেই আমির তার বাবার কোল থেকে নেমে যুবকটির দিকে রিভলবার লক্ষ করে বলে উঠল, “এইবার হাম তোমাকে গুলি করেগা।”

নাজির সাহেব যুবকটির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন । একে কোথায় দেখেছেন যেন। অথচ ঠিক স্মরণও করতে পারছিলেন না। হঠাৎ পেছন থেকে ‘কড়াফোন’হল, অর্থাৎ অন্দর মহলের দিককার দরজাটার কড়ার শব্দ হল। নাজির সাহেব দোরের ফাঁকে মুখ দিয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই ভিতর থেকে মৃদু শব্দ এল, “চিনতে পারছে না? ও যে আমাদের আনসার ভাই!

নাজির সাহেব দৌড়ে এসে যবুকটিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “আরে তৌবা! তুমি আনসার! আচ্ছা ভেক ধরেছ যা-হোক। এ কী কাবুলিওয়ালা সেজেছে, বল তো! আরে, ভিতরে এসো ভিতরে এসো।” বলতে বলতে তাকে টেনে একেবারে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

অন্দর যেতেই নাজির সাহেবের স্ত্রী এসে তাকে সালাম করল। যুবক হেসে বললে, কী রে বুঁচি, তোর চোখের তো খুব তারিফ করতে হয়। আচ্ছা, এই দশ বছর পরে দেখে চিনতে পারবি কী করে?" –এইখানে বলে রাখা ভালো, শ্রীমতি বুঁচি – ওরফে লতিফা বেগম – আনসারের 'খালেরা বহিন'বা মাসতুতো বোন। আনসারের চেয়ে বয়সে সে বছর পাঁচেকের ছোটো। কুড়ি বছরেই সে বুড়ি হলেও চারটি ছেলের মা হয়েছে।"

লতিফা আঁচলে চোখ মুছে বললে, 'মেয়েরা দশ হাজার বছর পরে দেখা হলেও আপনার জনকে চিনতে পারে ভাই, ওরা তো আর পুরুষ নয়!'বলেই নাজির সাহেবের দিকে বক্রদৃষ্টি দিয়ে তাকালে।

নাজির সাহেব মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "দেখ, স্ত্রীর ভাইকে দশজন ভদ্রলোকের সামনে চিনে ফেলে সম্বন্ধটা ফাঁস করে দিলে তুমি হয়তো খুশি হতে, কিন্তু আনসার হত না।"

আনসার নাজির সাহেবের কবজিটা ধরে রাম-টেপা দিয়ে বললে, "চোপ, শালা!"

তার টেপার তাড়নে নাজির সাহেব উঁহু উহুঁ করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "দোলাই ভাই! ছেড়ে দে! আমিই তোর শালা!"

আনসার হেসে হাত ছেড়ে দিলে।

নাজির সাহেব কবজিতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "উঃ! আর একটু হলেই হাতটা পাউডার হয়ে গেছিল আর কি! তুমি তেমনই গোঁয়ার আছ দেখছি!"

লতিফা হেসে বললে, "এখন তোমার এই ঝুলঝোপপুর পোশাকগুলো খুলে ফেলো দেখি! তৌবা, তৌবা! কী চেহারাই করেছ! কাপড়-চোপড় আছে সঙ্গে, না এনে দেব? আগে নেয়ে নেবে, না চা আনব?"

আনসার মেঝেতেই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে উঠল, “আঃ! কী নাম শুনালি রে বুঁচি! চা! চা! আঃ! আগে চা নিয়ে আয় তো, তারপর সব হবে!” বলেই গুন গুন করে গাইতে লাগল –

কাপ-কেটলিবাসিনী সিদ্ধিবিধায়িনী
মানস-তামসমোষিণী হে!
দুগ্ধ ও শর্করা-মিশ্র শ্বেতাম্বরা
চিনা-ট্রেবাহিনী জাড্য হরে।

লতিফা চা আনতে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, ‘পাগল!’

একটি ছোট্ট কথা! ওতেই মনে হল, যেন লতিফা তার প্রাণের সমস্ত সুধা দিয়ে উচ্চারণ করলে ওই কথাটি। ঘর-ছাড়া ভাইকে বহুকাল পরে কাছে পেয়ে বোনের প্রাণ বুঝি এমনই করেই তোলপাড় করে ওঠে।

চা করতে গিয়ে সেদিন একটু অতিরিক্তই দেরি হল। সেদিন উনুনের সকল ধোঁয়া বুঝি লতিফার চোখে ভিড় করে জমেছিল এসে। সেদিন চায়ের জলের অর্ধেকটা ছিল কেটলির, আর অর্ধেকটা চোখের।

মৃত্যুক্ষুধা - ১৬

চা খাওয়া হলে পর লতিফা বলে, “দাদু, তুমি তোমার ওই কাবলিওয়ালার পোশাক খুলে ফেল দেখি। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে! মাগো! ওই ময়লা গদ্দর পরে থাক কী করে তাই ভাবছি!

আনসার হেসে বললে, “গদ্দর নয় রে বুঁচি, এর নাম খদ্দর। একটু থাম না তুই, তারপর দেখবি, কীরকম রাজপুত্তুরের মতো চেহারা করে ফেলি।”

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে শেভ করে স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে যখন আনসার বেরুল, তখন তাকে সত্যিসত্যিই রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছিল।

নাজির সাহেব ও লতিফা মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে আনসারকে বারে বারে দেখতে লাগল।

লতিফার ছেলেগুলি ততক্ষণে এসে বেশ করে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। এবং আমিরের রিভলবারের আওয়াজে চাঁদ-সড়ক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। সে বারে বারে আসে আর তার মাকে বলে, ‘বুঝলে মা, আমি এইটে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাব। মামা আর আমি ইংরেজকে একেবারে এই গুড়ুম!’বলেই তার এবং মামার শত্রুর উদ্দেশে রিভলবারের আওয়াজ করে।

আনসার বললে, ‘বুঝলি রে বুঁচি ওই রিভলভারটা নিয়ে আজ যা করেছি ট্রেনে। এক বেটা টিকটিকি আমার পিছু নিয়েছিল আজ। শুধু আজ নয়, ওরা আছেই আমার পিছনে। রাস্তায় আমার একটি বন্ধু ছিল সাথে। মাথায় একটা হঠাৎ খেয়াল চেপে গেল। আমি বন্ধুটিকে চুপ করে বললাম, চুপি চুপি ওই টিকটিকি বাবাজিকে খবর দিতে, আমার কাছে রিভলবার আছে। সে গিয়ে খবর দিতেই, আর যায় কোথায়! দেখি, শ্রীমান রানাঘাট স্টেশনে এক ডজন কনস্টেবল নিয়ে হাজির। আমি নামতেই

আমাকে বললে, ‘আপনি থানায় আসুন, আপনাকে আমাদের দরকার আছে।’আমি বললাম, ‘আমায় সেখানে চা খেতে দেবেন তো?’রেলওয়ে-পুলিশের দারোগাবাবু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, ‘আজ্ঞে, চা-জলখাবার সব প্রস্তুত রেখে আপনাকে নিতে এসেছি।’আমি হেসে বললাম, ‘ধন্যবাদ! চলুন!’তারপর থানায় না নিয়ে গিয়ে সার্চ করে যখন পেলে এই খেলনার রিভলবারটা, তখন তাদের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল রে বুঁচি, তা ঠিক বলে বুঝাতে পারব না। গোবর থাকলে ছাঁচ তুলে নিতাম!” বলেই গগনবিদারী হাসি।

লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, “আচ্ছা দাদু, তুমি এখনও ছেলেবেলাকার মতোই দুষ্টু আছ দেখছি। সে যাক, তুমি এতদিন ছিলে কোথায়, বল তো?”

আনসার হেসে বললে, “আরে, এত বড়ো খবরটাই রাখিসনে তুই? আজ আসছি ময়মনসিংহ থেকে। সেখানে এসেছিলাম সিলেট থেকে। সিলেট গেছিলাম ত্রিপুরা থেকে। কুমিল্লা গেছিলাম চাটিগাঁ থেকে।”

নাজির সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, “আরে থামো থামো, আর বলতে হবে না। বুঝেছি, টো টো কোম্পানির দলে নাম লিখিয়েছে তুমি, এই তো?”

আনসার বললে, “কতকটা তাই! তবে একেবারে বিনা উদ্দেশে নয়। ঘুরি, সাথে সাথে একটু কাজও করি।” বলেই হঠাৎ বলে উঠল, “বুঝলি রে বুঁচি, তোদের এখানে কিন্তু একদিনের বেশি থাকছিনে।”

লতিফা ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠল, “এই তিন ঘন্টার মধ্যে আমাদের এখানটা তোমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল নাকি দাদু?”

আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, “অভিমান করিসনে ভাই, সব কথা শুনলে তোরাই বাড়িতে জায়গা দিতে সাহস করবিনে।”

নাজির সাহেব বললেন, “জানি ভাই, তুমি দেশের কাজ নিয়ে পাগল। তা হলেও এত অল্পে আমার চাকরি যাবে না – সে ভয় তোমার করতে হবে না। ”

আনসার বললে, “দাঁড়াও না একটু, এখনই থানা থেকে খবর নিতে আসবে। আমার আসবার আগেই এখানে ‘সাইফার টেলিগ্রাম’এসে গেছে যে, ১০৯ নম্বর যাত্রা করলে! ”

লতিফা বলে উঠল, “১০৯ নম্বর কী দাদু?”

আনসার বললে, “ও-সব বুঝবিনে তোরা। আমাদের রাজনৈতিক অপরাধীদের একটা করে নম্বর আছে – সমস্ত সি.আই.ডি. পুলিশ অফিসারের কাছে একটা করে লিস্ট থাকে। পাছে অন্য কেউ জানতে পারে তাই আমাদের নাম না নিয়ে নম্বরটার উল্লেখ করে চিঠিপত্র লেখে বা তার করে।” –বলেই আনসার হেসে বললে, “আমাদের কি কম সম্মানরে বুঁচি! সর্বদা সাথে দুজন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী। কোথাও গেলে-এলে আগেই পুলিশের অফিসার অভিনন্দিত করে স্টেশনে! তারপর দুবেলা আমাদের দিন কেমনভাবে কাটছে, তার খবর নেওয়া! একেবারে দ্বিতীয় লাট সাহেব আর কী! ”

লতিফার কিন্তু কেন চোখ ছল ছল করে উঠল। আনসারের দিকে তার অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে বললে, “তোমায় ছেলেবেলা থেকেই তো আমি জানি দাদু, তুমি চিরটাদিন এমনই পরের দুঃখে পাগল। তবু আজ কেমন ইচ্ছে করছে, আমার যদি শক্তি থাকত, তোমাকে এমন করে মরণের পথে এগুতে দিতাম না। কিছুতেই না। আচ্ছা দাদু, তোমার কীসের দুঃখ, বলতো? বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, বাপ-মা, ভাই-বোন – কিছুরই তো অভাব নেই তোমার; কিন্তু তোমায় দেখে কে বলবে, তোমার আত্মীয় স্বজন কেউ আছে – তোমার ঘরবাড়ি বলতে কিছু আছে!”

আনসার বিষাদ-জড়িত কণ্ঠে বললে, “আমি তো কোনো দিন কারুর কাছে বলিনে ভাই, যে, আমার কোনো-কিছু নেই – কেউ কোথাও নেই। দুনিয়ার সব মানুষ একই ছাঁচে ঢালা নয় রে, বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে

দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজনের কেউ নয়ই! আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না! আনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়হারাদের সাথি আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।”

মৃত্যুক্ষুধা - ১৭

শেষের দিকটায় আনসার যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগল, "আমি এখানে কেন এসেছি জানিস? জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মতও বদলে গেছে। আমি এখন.." বলেই কী বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠল, "বুঁচি, এখনও চরকা কাটিস?"

লতিফা হেসে বললে, "না দাদু, এখন আমার চারটি ছেলে মিলে আমাকেই চরকা ঘোরা করে। এখন আপনার চরকাতে তেল দিবার ফুরসত পাইনে, তা দেশের চরকা ঘুরাব কখন।"

আনসার হেসে বললে, "হুঁ, এখন তাহলে চরকার সুতো ছেড়ে কোলের সুতদের নিয়েই তোর সংসারের তাঁত চালাচ্ছিস। দেখ, ও ল্যাঠা ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিস ভাই। আমি এখনই বলছিলাম না যে, আমার মত বদলে গেছে। এখন আমার মত শুনলে তুই হয়তো আকাশ থেকে পড়বি। বাঁক বোঝাই করে করে চরকা বয়ে বয়ে যার কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে, তোর সেই চরকা-দাদু আনসারের মত কী শুনবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।"

লতিফা সত্যি সত্যি এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল। সে বললে, "বল কী দাদু! ওরে বাবা, চরকা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য তুমি নাকি মাহ্মুদকে একদিন কান ধরে সারা ঘর নাক ঘেঁষড়ে নিয়ে গিয়েছিলে! ওমা, কী হবে! শেষে কিনা তুমি চরকায় অবিশ্বাসী হলে?"

আনসার এক গাল পান মুখে দিয়ে বললে, "সত্যি তাই। আমি আজ মনে করি যে, আর সব দেশ মাথা কেটে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এ দেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে?"

নাজির সাহেব বললেন, “দোহাই দাদা, ও মাথা কাটার কথাটা যেখানে-সেখানে বলে নিজের কাঁচা মাথাটাকে আর বিপদে ফেলো না!”

আনসার হেসে বললে, “তার মানে, কোনো এক শুভ প্রভাতে মাথাটা দেহের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন করে বসবে – এই তো? তা ভাই, যে দেশের মাথাগুলো নোয়াতে নোয়াতে একেবারে পায়ের কাছে এসে ঠেকেছে, সে-দেশের দু একটি মাথা যদি খাড়া হয়ে থেকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ খাঁড়ার ঘা-ই লাভ করে তাহলে হেঁট মাথাগুলোর অনেকখানি লজ্জা কমে যাবে মনে করি।”

লতিফা বললে, “চুলোয় যাক তোমাদের রাজনীতি! এখন আমি বলি দাদু, তুমি চিরকালটা এমনই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েই কাটাবে?”

আনসার হেসে বলল, “চুলোয় আমার চরকাকে দিয়েছি – রাজনীতিটা দিতে পারব না বোধহয়। তুই ভুল বললি বুঁচি, আমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইনি। বনের খেয়েই বনের বাঘ তাড়াচ্ছি! ঘরের খাওয়া আমার রুচল না, কী করবি, কপাল!”

লতিকা হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, “যাক তুমি কারুর কথাই কোনোদিন শোননি, আজও শুনবে না। তাই ভাবছি, কী করে আমাদের মনে করে এখানে এলে!”

আনসার বললে, “আমি চিরকালই ঠিক আছি। একেবারে বিনা কাজে আসিনি আগেই বলেছি। এখানে একটা শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিক সংঘের একটা করে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়তো মাসখানেক বা তারও বেশি থাকতে হবে। এই তো ময়মনসিংহ-এ দু মাস থেকে এলাম।”

লতিফা ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে নেচে উঠে বললে, “সত্যিই দাদু! তুমি এখানে অতদিন থাকবে? বাঃ বাঃ! কী মজাটা না হবে তাহলে। আমি আজই চিঠি দিচ্ছি খালা-আম্মাকে– তাঁরা সব এসে আমাদের এখানে থাকবেন এখন কিছুদিন। দাদু, লক্ষ্মীটি, এক মাস না দু মাস, কেমন?”

আনসার হেসে ফেলে বললে, “তুইতো খোকার মা হয়েও আজও খুকিই আছিস দেখছি রে। চিঠি লেখ, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমি আমার কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকব যে, তোদের সঙ্গে হয়তো সারাদিনে একবার দেখা করতেই পারব না! আমি এখানে থাকলেও তো তোদের এখানে থাকতে পারব না! নাজির সাহেবের পিছনে টিকটিকি লেগে একেবারে না, নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে।”

লতিফার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এক নিমেষে ম্লান হয়ে গেল, –শিশুর হাতের রংমশাল জ্বলে নিবে যাওয়ার পর তার দীপ্ত মুখ যেমন নিরুজ্জ্বল হয়ে ওঠে – তেমনই!

মৃত্যুক্ষুধা - ১৮

এরপর দু তিন দিন কেটে গেছে। এবং এই দু তিন দিন আনসার গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রি, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমতো হুলস্থুল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক খ্যাপাতে। সরকারি কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলেছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমনকী কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রুক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বসে চা খেতে খেতে আনসার কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। গল্প সেদিন কিছুতেই জমছে না দেখে নাজির সাহেবও কেমন বিমনা হয়ে যাচ্ছিলেন। আনসার এ-কয়দিন ঝড়ের মতো এসে নাকে-মুখে যা পেয়েছে দুটো গুঁজে দিয়ে আবার তার কুলি-মজুর, মেথর-চাঁড়ালদের বস্তিতে ঘুরছে। লতিফা রাগ করে অভিমান করে কেঁদেও কিছু করতে পারেনি। আনসার হেসে শুধু বলেছে, “পাগলি!” সে-হাসি এমন করুণ, এমন বেদনামাখা, আর ওই একটি কথা এমন স্নেহ-সিঞ্চিত সুরে বিজড়িত যে, তারপর লতিফা আর একটি কথাও বলতে পারেনি। বেদনা সে যতই পাক, তার বুক সঙ্গে সঙ্গে এই গর্বেও ভরে উঠেছে যে, তার এই ছন্নছাড়া ভাইটি সর্বহারা ভিখারিদের জন্যই আজ পথের ভিখারি। তাকে কাঙাল করেছে এই কাঙালদের বেদনা। গর্বে কান্নায় তার বুকের তলা দোল খেয়ে উঠল।

আজ সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিতভাবে আনসার এসে চা চেয়ে যখন ইজিচেয়ারটায় ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল, তখন লতিফা খুশি যেমন হল, তেমনই আনসারের ওই ক্লান্তস্বরে কেমন একটু অবাকও হয়ে গেল। এমন বিষাদের সুর তার কণ্ঠে সে কোনোদিন শুনেনি।

চা এনে যখন সে পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল, তখন নাজির সাহেব আপনার মনেই রাজ্যের মাথামুণ্ডুহীন কীসব বকে চলেছেন, আর আনসার মাঝে মাঝে আনমনে হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

লতিফা হেসে বললে, "আচ্ছা বেহুঁশ লোক যাহোক তুমি! কাকে বলছ আর কে শুনছে তোমার কথা, বলো তো! কী ভাবছ দাদু, এমন করে?"

নাজির সাহেব বেচারা মাথা চুলকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, "অ! উনি আমাদের হবু ভাবি সাহেবের কথা ভাবছেন! আরে, আগে থেকে বলতে হয়? তাহলে কি আর এমন সময় এ বদরসিকতা করি! কিন্তু ভাই, তোমার এই মেথর-মুর্দাফরাশ-ভরা মনে যে কোনো সুন্দর মুখ উঁকি দিতে পারবে – সে ভরসা করতে কেমন যেন ভরসা পাচ্ছিনে।"

আনসারের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, কি দিল না। সে একমনে চা খেয়ে যেতে লাগল। চায়ের প্রসাদে ততক্ষণে তার বিষণ্ণতা অনেকটা কেটে গেছে।

লতিফা নাজির সাহেবকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "তুমি থামো তো একটু! সত্যি দাদু, লক্ষ্মীটি, বলো না – আজতুমি এমন চুপচাপ কেন?"

নাজির সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেপথ্য বলার মতো করে উঠলেন, "বাঁদরকে কে পুয়াল-চাপা দিলে! ইয়া আল্লাহ্! আল্লাহু আকবর!"

লতিফা ভুরু বাঁকিয়ে খর চোকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আবার!"

এইবার আনসার হেসে ফেলে বললে, "নাঃ, আর আমায় গম্ভীর হয়ে থাকতে দিলিনে দেখছি, বুঁচি!"

মেঘ অনেকটা কেটেছে দেখে লতিফা খুশি হয়ে আবদারের সুরে বলে উঠল, "কী ভাবছিলে এতক্ষণ, বলো না, দাদু!"

আনসার চায়ের প্রথম কাপটা শেষ করে দ্বিতীয় কাপটার চুমুক দিয়ে বললে, "যাঃ! ও কিছু না! এমনই কী যেন একটু ভাবছিলাম। দেখ বুঁচি, এ-দেশের কিচ্ছু হবে না। "

লতিফা চালাক মেয়ে। আনসার এড়িয়ে চলতে চাইছে দেখে সেও বাঁকা পথ অবলম্বন করলে। আনসারের ও-কথার উত্তর না দিয়ে সে সোজা প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা দাদু, রুবির খবর জান কিছু?"

আনসার চমকে উঠল। সে এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। দু তিন চুমুকে চা খেয়ে অন্য দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, "এইবার তার সাথে দেখা হয়েছিল রে বুঁচি।"

লতিফা আরও সরে এসে বললে, "কোথায় দাদু? তোমায় দেখে সে নিশ্চয়ই চিনতে পারলে। কী বললে দেখে? তুমি কী করে চিনলে তাকে?"

আনসার ম্লান হাসি হেসে বললে, "দেখা হল ময়মনসিংহে। চিনতে দেরি না হলেও বিশ্বাস করতে দেরি হয়েছিল আমার। বেশ একটু দেরি..." বলেই আনসার দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার দু চুমুক চা খেয়ে শান্তস্বরে বললে, "আমি ছাত্রদের একটা মিটিং-এ বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন সে মিটিং-এ। ওরই মধ্যে দেখি একটি বিধবা মেয়ে দু-হাতে চিক সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ভালো বক্তৃতা দিতে পারি বলে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছিল, কিন্তু সেদিন স্পষ্টই বুঝলাম, আমার বক্তৃতা শুনে কেউ খুশি হয়ে উঠছেন না। আমার ছাত্র-বন্ধুরা হতাশ হয়ে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমার কথা তখন কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে।"

লতিফা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিল বললে ঠিক বলা হয় না – গিলছিল যেন সব কথা। সে কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "রুবি বিধবা হয়েছে, দাদু?"

আনসার চায়ের কাপটায় ঝুঁকে পড়ে মুখটা আড়াল করে বললে, 'হুঁ!'

মনে হল, সে বুঝি আর কিছু বলতে পারবে না। কেউ একটি কথাও বললে না, কেমন একটা বেদনাময় বিষণ্ণতায় সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মেঘলা দিনের সন্ধ্যা যেমন নামে বন্ধুহীনের বিজন ঘরে।

চা তখন ঠাণ্ডা হিম হয়েও গেছে। তারই সবটা ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে আনসার একটু অধিক সহজ সুরে বললে, "তারপর দেখা হল – অনেক কথাও হল রুবির সাথে-রুবির বাবা-মার সাথে। – রুবির বাবা যে এখন ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রে বুঁচি!"

কিন্তু বুঁচি কিছু বলবার আগেই সে বলে যেতে লাগল, "রুবির বাবা অবশ্য ভয়ে ভয়েই আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। ওর মা কিন্তু তেমনই আদর-যত্ন করলেন আমায়। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ বারে বারে জলে ভরে উঠেছিল।

লতিফা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "রুবি কী বললে, বলো না দাদু!"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "বলছি থাম। রুবির বিয়ে হয়েছিল একটি আই.সি.এস. পরীক্ষার্থী ছেলের সাথে। ছেলেটি আমারই সহপাঠী ছিল – অবশ্য আমার বন্ধু ছিল না – নাম তার মোয়াজ্জম। বিলেতে যাওয়ার আগেই বিয়ের এক মাসের মধ্যেই সে মারা যায়। সে আজ এক বছরেরও বেশি হল। বিয়ের আগেই রুবি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। এবার প্রাইভেটে আই.এ.দেবে। মনে হল ওর বাপ-মায়ের ইচ্ছা, ওকে এই লেখাপড়ার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখেন। এর জন্য যথেষ্ট খরচও করছেন তাঁরা। রুবিও খুব মন দিয়ে পড়ছে শুনলাম।"

বলে খানিক চুপ করে থেকে আনসার বললে, "রুবির অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানেন, তবে এই বৈধব্য তাকে বড়ো বেদনা দিতে পারেনি – এটা বেশ বোঝা গেল। স্বামীকে সে চেনেনি – আমার যেন মনে হল, তাকে সে চিনবার চেষ্টাও করেনি। তার পড়বার ঘরে তার স্বামীর একটা ফটো পর্যন্ত নেই। অথবা সে যে

বিধবা, একটু চেষ্টা করেই সে এ-কথা যেন জানাতে চায় তার আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদে। তার মা-বাবা কিছুতেই তাকে পাড়ওয়ালা কাপড় বা গয়না পরাতে পারেনি। পরে সাদা থান, জুতা পরে না, পান খায় না, –যাকে বলে সর্বপ্রকারে নিরাভরণা, কিন্তু এই নিরাভরণা, রুক্ষবেশে তাকে যে কী সুন্দর দেখায় রে বুঁচি, তা যদি একবার দেখতিস! বৈধব্যের এত রূপ আর আমি দেখিনি!”

বলেই নিজের এই প্রশংসা-উক্তিতে লজ্জিত হয়ে সে নিম্নস্বরে বললে, “কিন্তু বুঁচি, ও রূপকে ভক্তি করা যায়, ভালোবাসা যায় না!”

নাজির সাহেবফোঁস করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর ক্লিনসেভড গালের চিবুকের কল্পিত দাড়িতে বামহাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠলেন, “সোবহান-আল্লাহ্! সোবহান-আল্লাহ্!’

লতিফা ও আনসার দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। আনসার নাজির সাহেবের ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বলে উঠল, “আরে বে-অকুফ! এর মধ্যে লভটভের কিছু গন্ধ নেই!”

নাজির সাহেবের ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেলেন, “দেখ ভাই তারকেশ্বরের ষাঁড়! এ ঘাড়ে এমন করে ধাক্কা মেরো না! এই ঘাড়ই হচ্ছে তোমার বোনের সিংহাসন। এ-ঘাড়ই যদি ভাঙে তা হলে উনি চড়বেন কোথায়?”

লতিফা হেসে বললে, “শ্যাওড়া গাছে! বেস, আমি পেতনিই হলাম। এখন গোলমাল যদি কর, সত্যিই ভেঙে দেব! বলো ভাই দাদু, ,তারপর কী হল?”

আনসার বললে, “জানিস, একদিন আমি সোজা রুবিকে বললাম যে, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও সে যে বিধবা, তা বুঝবার কষ্ট হত না কারুর। সে বললে কী, জানিস? সে বললে, যে, সে তার বাপ-মাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই অমন করে থাকে। তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও নাকি তার বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং আবারও বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তলে তলে – তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। সে

একদিন তার মায়ের সামনেই আমায় বললে, “দেখ আনু ভাই, যাকে কোনোদিনই জীবন স্বীকার করিনি কোনো-কিছু দিয়ে হতভাগ্যের মৃত্যু-স্মৃতি আমায় বয়ে বেড়াতে হবে সারাটা জিন্দেগি ভরে – নিজেকে এই অপমান করার দায় থেকে কী করে মুক্তি পাই, বলতে পার?”

আমি শিউরে ,উঠলাম। বললাম, “তাই যদি সত্যি হয় রুবি, তবে এ-অপমান শুধু তোমাকে নয় – সেই মৃত হতভাগ্যকেও গিয়ে লাগছে। এ-নিষ্ঠুরতা করে কারুর কোনো মঙ্গল হবে না রুবি।”

রুবি তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলে, “একে শুধু তুমিই নিষ্ঠুরতা বলতে পারলে। কিছু মনে কোরো না আনু ভাই – অতি বড়ো নিষ্ঠুর ছাড়া আর কেউ এত বড়ো কথা আমায় বলতে পারত না। তুমি শুধু এর নিষ্ঠুর দিকটাই দেখলে? যে নিষ্ঠুর করে তুলেছে আমায় তাকে দেখলে না!”

বলেই সে চলে যেতে যেতে বলে গেল, “ফুল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কাঁটা তো আছে! ফুল থাকলে বুকে মালা হয়ে থাকত, এখন কাঁটা – কেবল পায়ের তলায় বিঁধবে!”

“এর পরেও কত দিন দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে – কিন্তু আমি আর সাপের ন্যাজে পা দিতে সাহস করিনি। একেবারে কাল-কেউটে!”

লতিফা একটু উত্তেজিত স্বরেই বলে উঠল, “কিন্তু তুমি চিনবে না দাদু, তুমি সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া! ছোবল মারলেও ওর মাথায় মণি আছে। সাপের মাথার মণি সাতরাজার ধন, তা কি যে-সে পায়?”

বলেই সে চোখ মুছল! আনসার কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল।

আজ কেন যেন তার প্রথম মনে হল সে সত্যিই দুঃখী। মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে – যা অতি গভীর, অতলস্পর্শী! নিখিল-মানবের

দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা – সে যেন মানুষকে ধেয়ানী স্বস্থ করে তোলে। বড়ো মধুর, বড়ো প্রিয় সে-দুঃখ!

সে হঠাৎ বলে উঠল, "যেদিন আমি চলে আসি, বুঁচি, সেদিন সে স্টেশনে এসেছিল। ট্রেন যখন ছাড়ে, তখন আমার হাতে একটা জিনিস দিয়ে বললে, "এইটে বিয়ের রাতে – তোমায় মনে করে গেঁথেছিলাম। আজ শুকিয়ে গেছে, তবু তোমায় দিলাম।" – বলেই সে টলতে টলতে চলে গেল!

"ট্রেন ছাড়লে দেখলাম, একটি শুকনো মালা!"

নাজির সাহেব বলে উঠলেন, "কী করলি ভাই, সে মালটা?"

আনসার ধরা গলায় বলে উঠল, "পদ্মার জলে ফেলে দিয়েছি।"

লতিফা একটি কথাও না বলে আস্তে আস্তে উঠে গেল।

মৃত্যুক্ষুধা - ১৯

চাঁদসড়কে সেদিন ভীষণ একটা হইচই পড়ে গেল, মেজোবউ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।

সত্যি-সত্যিই সে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তবে তার একটু ইতিহাসও আছে।

মেজোবউ কিছুদিন থেকে খ্রিস্টান মিশনারি মিস জোন্সের কাছে গিয়ে একটু সেলাই ও লেখাপড়া শিখছিল। মিশনারিরা ওদের ধর্মপ্রচারের জন্য হয়তো একটু গায়ে পড়েই দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দুদের অসুখ-বিসুখে ওষুধ-পত্তর দিয়ে সাহায্য করে এবং তারা অনেককে তাদের ধর্মে দীক্ষিতও করতে পরেছে। কিন্তু মেজোবউয়ের ব্যাপার একটু অন্য রকম।

মিস জোন্সের কীজন্য জানি না, প্রথম দেখাতেই মেজোবউকে চোখে ধরে গিয়েছিল। শুধু চোখে নয়, হয়তো মনেও। মেজোবউয়ের নামে পাড়ায় একটা বদনামও আছে যে, ওকে একবার দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না।

মেজোবউ সুন্দরী! কিন্তু ওই সৌন্দর্যটুকুই ওর সব নয়। এক একজন মানুষের চোখে-মুখে এক একটা জিনিস থাকে, যার জন্য তাকে দেখামাত্রই মনটা খুশি হয়ে ওঠে, 'তুমি'বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। শ্রী, লাবণ্য, সুষমা –এর কোনো-একটা নাম দিয়ে ওর মানে করা যায় না। অমনই মায়া-মাখানো চোখ-মুখ মেজোবউয়ের!...

পাড়ায় পুরুষ মেয়ে সবাই বলতে লাগল, এইবার মাগিরা মেজোবউকে 'আড়কাঠি'করে সব বউ-ঝিকে 'খেরেস্তান'করে তুলবে।

প্যাঁকালের মা-র চিৎকার ও কান্নায় সমস্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে কান্না-চিৎকারে দিবারাত্রির মধ্যে বিরাম ছিল না। কখনও তা অচল হয়ে তাদের ঘরের

আঙিনা থেকেই দিগ্-দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হতে লাগল, কখনও বা সচল হয়ে চাঁদসড়ক থেকে কুর্শিপাড়া – কুর্শিপাড়া থেকে কাঠুরেপাড়া – কাঠুরেপাড়া থেকে হাটবাজার ঘুরে – গির্জা-মসজিদ প্রদক্ষিণ করে ফিরতে লাগল।

মেম-সায়েবদেরে সে যে-ভাষায় আপ্যায়িত করতে লাগল তার তুলনা মেলা ভার।

ভাগ্যিস মেম-সায়েবরা আমাদের বাংলা ভাষার সব মোক্ষম-মোক্ষম গালির অর্থ বোঝে না, বুঝলে তারা মেজোবউকে কাঁধে করে তার বাড়ি বয়ে রেখে যেত!

কলকাতায় প্যাঁকালেকে খবর দেওয়া হল। কুর্শি বিশেষ করে তাগিদ ও পরামর্শ দিতে লাগল ওদের বাড়ি এসে যে, এ সময় প্যাঁকালে এসে একটা 'ধুমখাত্তর'কাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে! চাই কী – সে যা পুরুষ মর্দ, মেম-সায়েবকেও ধরে নিয়ে আসতে পারে ইচ্ছে করলে।

পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ি মউলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। মউলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই মওলানা হযরত পির গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানী সাহেবকে এই গোমরাহ্ বেদীনদের নসিহত ও দরকার হলে 'বহস' করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ির ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনেরো টাকা জোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত'থাকবে।

আনসার সব শুনেছিল তার বোনের কাছে। কাজেই সে বেশ একটু উৎসাহ নিয়েই এ নিয়ে পাড়ায় কী হয় শুনতে এসেছিল মউলুদের জলসাতে। সব শোনার পর একটি কথাও না বলে নাজির সাহেবের বাসায় ফিরে গেল।

বাসায় গিয়েই ইজিচেয়ারটাতে শুয়ে বললে, "ওরে বুঁচি, বড্ড মাথা ধরেছে, একটু চা দিতে পারবি?"

লতিফা হেসে বললে, “না, পারব না! কী হল দাদু ওদের সভায়, বললে না যে!”

আনসার তিক্তস্বরে বলে উঠল, “ঘোড়ার ডিম! মেজোবউ হল খ্রিষ্টান, লাভ হল পির আর মওলানা সাহেবদের। আর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা –বেচারি প্যাঁকালের মা-র কপাল তো এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকি ছিল – মোল্লাজি তা শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালেরা ঘরগুষ্টি মিলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে বুঁচি, তাহলে আমি কিছু বলব না।”–একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে বলে উঠল, “বুঝলি বুঁচি, প্যাঁকালের মা এত কেঁদে বেড়িয়েছে আজ, কিন্তু আজ মউলুদ শরিফ হয়ে যাওয়ার পর এবং পাড়ার মোল্লা-মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে তার কান্না একেবারে থেমে গেছে! আহা বেচারি! ওই ছাগল কটাই তো ওর সম্বল – তাই তাকে কাল বিক্রি করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে!”

আনসার উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। লতিফার চোখ-মুখের দুষ্টুমির দীপ্তি কখন ম্লান হয়ে কান্না-সজল হয়ে উঠেছিল, তা সে নিজেও টের পায়নি। হঠাৎ সে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, “দাদু লক্ষ্মীটি, তুমি একবার কাল মেজোবউয়ের আর মেম-সায়েবের সাথে দেখা করতে পার? তোমার ভরসা পেলে ও খ্রিস্টান থাকবে না –এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমরা অল্পদিন হল কৃষ্ণনগর এসেছি, এর মধ্যেই ওর সাথে যে কয়টা দিন আলাপ হয়েছে, তাতে বুঝেছি – ও আর যাই হোক, খারাপ মেয়ে নয়। ও বড্ড অভিমানিনী। পাড়ার লোকের যন্ত্রণাতেই সে খ্রিস্টান হল। জানো দাদু, ও মেম-সায়েবের কাছে একটু যাওয়া-আসা করত বলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করবে বলে কেবলই ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে এমন বদনাম দিতে লাগল যে-বদনাম ওর ওপর দেওয়ার মতো মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। মানুষ দুঃখ-অভাবে পড়লে তার কি এমনই অধঃপতন হয় দাদু সকল দিক দিয়ে?...”

আনসার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাত্রির তারা-খচিত আকাশের দিকে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল – ওই রাত্রির আকাশের মতোই অসীম দুর্জ্ঞেয় রহস্য-ভরা এই পৃথিবীর মানুষ।

লতিফা চা করবার জন্য উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ আনসার বলে উঠল, "সত্যিই রে বুঁচি, ক্ষুধিত মানুষ – অভাব-পীড়িত মানুষের মতো সকল-দিক দিয়ে অধঃপতিত আর কেউ নয়! ক্ষুধা আছে বলেই ওরা কেবলই পরস্পরের সর্বনাশ করে। দু মুঠো অন্নের অভাবে ওদের আত্মা আজ সকল রকমে মলিন। তুই বুঝবিনে বুঁচি, ওদের অভাব কত অতল অসীম, ওদের দুঃখ কত অপরিমেয়! আমি দেখেছি, ওই হতভাগ্যদের দুর্দশার নিত্যকার ঘটনা – তাই তো আমার মুখের অন্ন এমন তেতো হয়ে উঠেছে। এক মুঠো ডাল-মাখা ভাত যখন খাই, তখন গলার ও-ধারে যেন ও আর পেরোতে চায় না, আটকে যায়! মনে হয় আকাশের ওই তারার মতোই ক্ষুধিত চোখ মেলে কোটি কোটি নিরন্ন নর-নারী আমার ওই এক গ্রাস ভাতের দিকে চেয়ে আছে! ওদের দুঃখ তুই বুঝবিনে বুঁচি। দু মুঠো অন্নের জন্য ওরা মেথর হয়ে তোদের ঘরে-বাইরের সকল রকম ময়লা-নোংরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। ধাঙড় হয়ে –ভোর না হতেই তোদের গাঁয়ের ধুলো দু মহাত দিয়ে পরিষ্কার করে পথে পথে। তাদের কথা বলিসনে বুঁচি –অন্তত ওদের দোষ দিসনে আমার কাছে কখনও! তুই তো মা, তুই কি বিশ্বাস করবি, যে ক্ষুধার জ্বালায় মা তার ছেলের হাত থেকে কেড়ে খাচ্ছে? নিজের ছেলেমেয়েকে নরবলির জন্য বিক্রি করছে দু মুটো অন্নের জন্য? খোদা তোকে সুখে রাখুন, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা যে কী জ্বালা, তা যদি একটা দিনের জন্যও বুঝতিস, তাহলে পৃথিবীর কোনো পাপীকেই ঘৃণা করতে পারতিসনে! শুনবি একটা সত্যি ঘটনার কথা?"…

লতিফা চোখে হাত দিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "দোহাই দাদু, তোমার দু পায়ে পড়ি, আর বোলো না। এতেই আমার দম ফেটে যাচ্ছে।"

সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে টলতে টলতে উঠে গেল।

আনসার হেসে বললে, 'তোর সুখের অন্নকে এমন বিষিয়ে তোলা ভালো হয়নি রে বুঁচি! যাক, কাল আমি সত্যিই মেজোবউ আর মিস জোন্সের সাথে দেখা করব গিয়ে.... ! "

পরদিন সকাল চা খেতে খেতে নাজির সাহেব আনসারকে বলে উঠলেন, "কি হে! আজ নাকি শিকারে বেরুচ্ছ? দেখ দাদা, বাঘিনির কাছে যাচ্ছ মনে রেখ!"

আনসার হেসে বললে, "আমি শিকার করতে যাচ্ছিনে বেকুফ, আমি যাচ্ছি সুন্দরবনের বাঘকে – সুন্দরবনে ফিরিয়ে আনতে, সভ্য শিকারীর ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে।"

নাজির সাহেবও হেসে বললেন, "অন্য শিকারীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শেষে নিজেই বাণ হেনে বোসো না। দেখো, ও বড়ো শক্ত বাঘিনি হে, শেষে বাঘিনিই তোমায় শিকার করে না ফেলে।"

আনসার লতিফার দিকে আড়-চোখে চেয়ে একটু গলা খাটো করে বললে, "রক্ষে কর ভাই, বাঘের বাচ্চা পুষবার সখ হয়নি এখনও আমার, এ আমার বাঘ শিকার নয়, এ শুধু কষ্ট স্বীকার!"

নাজির সাহেব একটু জোরেই হেসে বললেন, "তোফা! তোফা! ওগো, আর এক কাপ চা দাও তোমার রসরাজ ভাইটিকে! কিন্তু দাদা, বাঘিনির না হয় বাচ্চা আছে, কিন্তু ওই সিংহী – যে ঘরে নিয়ে গেছে?"

আনসার হেসে উঠে বলে, "ওকে সিংহী বোলো না মূর্খ, ও হচ্ছে নীলবর্ণ শৃগালিনী। হাঁ, ওর কাছে আমায় একটু সাবধানেই যেতে হবে। ওদের নখ-দন্তকে ভয় করিনে, ভয় করি ওদের ধূর্তামিকে। মিশনারির মেম!"

নাজির সায়েব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “বাপ রে! মিশনারি! একে মিস, তাহে নারী! উঃ! একটা মিসফর্চুন না হয়ে যায় আজ! আই মিন ফরচুন ফর মিস!”

লতিফা ধমক দিয়ে বলে, “দোহাই! তোমার আর রসিকতা করতে হবে না! বুড়োকালে ওঁর রস উথলে উঠল! তোমার আজ হল কী বলো তো!”

আনসার হেসে বললে, “বুঝলিনে বুঁচি, ওঁর হিংসে হচ্ছে। একটুখানি মেম-সাহেবের সঙ্গে আলাপ করব গিয়ে, এ আর ওঁর সহ্য হচ্ছে না! তুই থাকতে তো ওঁর আর ওদিক পানে যাওয়ার ভরসা নেই!”

লতিফা উঠে যেতে যেতে বললে, “আমি আজই দিগ্‌দড়ি দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি আছি দাদা-ভাই, কিন্তু ভয় নেই, ওঁকে কেউ ছোঁবে না।”

নাজির সাহেবও উঠে যেতে যেতে বললেন, “পেতনিতে পেলে আর কেউ ছুঁতে সাহস করে!”

আনসার উঠে পড়ে বললে, “তোমরা এখন কলহ করো, আমি এখন চললাম। …”

গির্জায় গিয়ে আনসার শুনলে, মিসবাবাদের সঙ্গে দেখা করবার নিয়ম নেই। কিন্তু সে হাল ছাড়বার পাত্র নয়। পাদরি সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টা-খানিক তর্কের পর সে এই শর্তে রাজি হল যে, হেলেন ওরফে মেজোবউকে আনসার শুধু জিজ্ঞেস করবে, সে স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে যে মিশনারিরা ক্রিশ্চান করে নাই, এ-সম্বন্ধেও আনসার যথেচ্ছ প্রশ্ন করতে পারে। অবশ্য আনসারের খদ্দরের বহর ও তার ‘এজিটেটর’নামের জন্যই সে এই সুযোগটুকু পেল। আনসারও সাহেবদের স্পষ্টই বললে, “দেখো পাদরি সাহেব, আমি গেঁয়ো মোল্লা-মউলবি নই, যে, ধমকে তাড়িয়ে দেবে! মেজোবউ যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্ম নিয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু বলব না। আর যদি অন্য কোনো

উপায়ে ওর সর্বনাশ করে থাক, তাহলে এই নিয়ে দেশময় একটা হইচই বাঁধিয়ে দেব।”

সাহেব একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে, “নো মিস্টার! আপনে যঠেচ্ছ প্রশ্ন করেন আমাদের ভোগ্নি হেলেনকে, আঠাট ভূটপূর্ব মেজোবউকে। ডেখিবেন, টাহাকে স্বয়ং ঈশ্বর সটপঠে ডাকিয়াছেন! আমরা কেহ নয়!”

আনসার মনে মনে সাহেবের ‘সৎপথের’নিকুচি করে বললে, “সাহেব, এখন একটু ডাকতে পার শ্রীমতী হেলেনকে?”

সাহেব নিজে উঠে গিয়ে একটু পরেই মিস জোন্স ও মেজোবউকে নিয়ে ঘরে ঢুকল!

আনসার চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, “গুডমর্নিং মিস জোন্স! গুডমর্নিং মিস – আই মিন মিসেস হেলেন!”

মিস জোন্স স্মিতহাস্যে আনসারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, কিন্তু মেজোবউ বেচারি লজ্জায় এতটুকু হয়ে আধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল! মিস জোন্সের সরোষ ইঙ্গিতেও সে কোনো রকমেই একটা নমস্কারও করতে পারল না।

মেজোবউ আনসারকে চিনত এবং একটু ভালো করেই চিনত। কতদিন দূর হতে তার দৃপ্ত চরণে তারই বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছে। এমনি কেন যেন ওর ভালো লেগেছিল এই অদ্ভুত লোকটিকে! কতদিন সে বিনা কাজে লতিফার কাছে গিয়ে বসে থাকত এই লোকটিকে দেখবার জন্য – ওর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব শুনবার জন্য। ও যেন আলেফ-লায়লার কাহিনীর বাদশাজাদা, যেন পুথির হরমুজ, মনু-চেহের! আজ তাকেই সামনে দেখে মর্মাহত সাপিনির মতো সে কেবলই মুখ লুকাবার চেষ্টা করতে লাগল!

আনসার মেজোবউকে আবছা এক-আধটু দেখে থাকবে হয়তো! আর দেখে থাকলেও তার মনে নেই। তার কর্মময় জীবনে নারীমুখ চিন্তা তো দূরের কথা,

দেখবারও ফুরসত নেই। সে জানে শুধু কার্ল-মার্কস, লেনিন, ট্রট্‌সকি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক পরাধীনতা, অর্থনীতি। পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ ছাড়াও যে অন্যরকম মর-বেদনাবোধ থাকতে পারে – এ প্রশ্ন তার মনে জেগেছে এই সেদিন। নারীকে সে অশ্রদ্ধাও করে না, নারীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণও নেই। নারী সম্বন্ধে সে উদাসীন মাত্র।

আজ সে মুক্তাবগুণ্ঠিতা মেজোবউকে প্রথম চোখ মেলে চেয়ে দেখল। তাকে দেখামাত্র তার হঠাৎ যেন মনে হল, এর যেন কোথায় রুবির সঙ্গে মিল আছে। রুবির কথা মনে হতেই বুকের কোনো এক কোমল পর্দায় যেন চিড় খেয়ে উঠল। আনসার কেমন যেন অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগল।

মিস জোন্স ইংরেজিতে বললে, "মনে হচ্ছে আপনি একে চেনেন না। চিনলে অন্যের কথা শুনে এর কাছে আসতেন না।"

আনসারও ইংরেজিতে বললে, "ওকে জানি, তবে চিনিনে সত্য। ভয় নেই, আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি, শুধু জানতে এসেছি, স্বেচ্ছায় ক্রিশ্চান হয়েছে কি-না। আশা করি, এ প্রশ্ন করলে, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না।"

মিস জোন্স তারাগ্রমের 'জি'সুরের মতো মিহিন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, "কখনোই না! আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

ধন্যবাদ দিয়ে আনসার হঠাৎ প্রায়-প্রকম্পিতা মেজোবউয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা বলুন তো আপনার হঠাৎ খ্রিস্টান হওয়ার কারণ কী?

মেজোবউ তার আনতনয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বললে, "আমি তো হঠাৎ খ্রিস্টান হইনি।"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "তার মানে, আপনি একটু একটু করে খ্রিস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?"

মেজোবউ তার সেই জাদুভরা হাসি হেসে বললে, “জি না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিস্টান করেছেন!”

আনসার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল। তারপর সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বলে উঠল, ‘বুঝেছি, আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশি অত্যাচার করে আপনার মতো মেয়েকেও খ্রিষ্টান হতে বাধ্য করেছে!”

দুঃখিনী মেজোবউয়ের দুই চক্ষু এই দুটি দরদভরা কথাতেই অশ্রুতে পুরে উঠল। একটু পরেই টসটস করে তার গণ্ড বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেবের নিমেষে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তা আনসারের নজর এড়াল না।

মিস জোন্স কিছু বলবার আগেই আনসার বলে উঠল, “ভয় করবেন না, আমি আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন, তাহলে বহু মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে এর দ্বারা।”

মিস জোন্স ও পাদরি সাহেব দুজনেই অতিমাত্রায় খুশি হয়ে বললে, “ডেখুন বাবু, ইহারই জন্যে – এই মানুষেরই মুকটির জন্যেই তো আমাদের জিশু প্রেরণ করেছেন। আপনায় ঢন্যবাড, আমরা খ্রিস্টান হওয়ার আগে ঠেকেই হেলেনকে বালো বালো কাজ শেকাচ্ছে।”

মেজোবউ হঠাৎ অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল “আমি কি আপনার সাথে দেখা করতে পারি – যদি কোনোদিন ইচ্ছে হয়?” -- বলেই সে তার অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি পূজারিনির ফুলের মতো আনসারের পানে তুলে ধরল।

আনসারের বুক কেন যেন দোল খেয়ে উঠল! এ কোন মায়াবিনী? সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "নিশ্চয়ই, যখন ইচ্ছা দেখা করবেন। আমাকে আপনার কোনো ভয় নাই। আপনার এই ধর্ম-পরিবর্তনে আমি অন্তত এতটুকু দুঃখিত নই। আপনার মতো মেয়েকে তার যোগ্যস্থান দেওয়ার মতো জায়গা আমাদের এই অবরোধ-ঘেরা সমাজে নেই। – এ আমি আপনাকে দেখে এবং দুটি কথা শুনেই বুঝেছি!" – বলেই একটু থেমে আবার বললে, "আপনি যে ধর্মে থেকে শান্তিলাভ করেন। – করুন, আমার শুধু একটি প্রার্থনা, আপনারই চারপাশের এই হতভাগ্যদের ভুলবেন না –আপনার হাত দিয়ে যদি ওদের একজনেরও একদিনের দুঃখও দূর হয় – তবে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। আপনার মতো সাহসী মেয়ে পেলে যে কত কাজই করা যায়?"

মেজোবউ তার চোখমুখ মুছে ভরা কণ্ঠে বলে, উঠল, "আমায় দিয়ে আপনার কোনো কাজের সাহায্য যদি হয় জানাবেন, আমি সব করতে পারব আপনার জন্য!" –কিন্তু ওই 'আপনার জন্য'কথাটা বুঝি তার বেরিয়ে এসেছে। ওই কতাটা বলবার পরই তার চোখমুখ লজ্জায় রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

আনসারের মনে হল, সে যেন কোন নদী আর সাগরের মোহনাট উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যে এসে পড়েছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে, "আমায় হয়তো আপনি ভালো করে চেনেন না, লতিফা আমারই বোন। যদি ওখানে কোনোদিন যান, আমার সব কথা শুনবেন। আর দেখাও ওখানেই করতে পারেন – ইচ্ছা করলে।"

মেজোবউ ঠোঁটে হাসি চেপে বলে উঠল, "আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি। আমি ওখানেই দেখা করব গিয়ে। কিন্তু যেতে দিবেন তো ওখানে খ্রিস্টাননিকে?"

আনসার কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই মেজোবউয়ের ছেলেমেয়ে দুটি কোথা থেকে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "মা, তুই ইখেনে এয়েছিস আর আমরা খুঁজে খুঁজে মরছি!"

মেজোবউ তাদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ভারি গলায় বলে উঠল, "এই দুটোই আমার শত্রু। এখানে এসে তবু দু বেলা দুটো খেতে পাচ্ছে! ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি।"

আনসার তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মেজোবউয়ের ছেলেমেয়েকে একেবারে তার বুকে তুলে চুমো খেতে খেতে বললে, "তোরা কী খেতে ভালোবাসিস বল তো!" দুই শিশুতে মিলে তারস্বরে যে-সব ভালো জিনিসের লিস্টি দিলে, তা শুনে ঘরের সকলেই হেসে উঠল। কিন্তু হাসলেও আনসারের এই ব্যবহার সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। অতি সামান্য ঘরের ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবকের এই এত সহজভাবে চুমো খাওয়া তারা যেন দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

জাদুকরি মেজোবউয়ের মনে হতে লাগল, তার এতদিনের এত অহংকার আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। তাকে শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষও আছে জগতে! সে তার চেয়েও বড়ো জাদুকর। তার কেবলই ইচ্ছা করতে লাগল, দু হাত দিয়ে, এই পাগলের পায়ের ধুলো নিয়ে চোখে-মুখে মেখে ধন্য হয়, কিন্তু লজ্জায় পারল না। আর কেউ না থাকলে হয়তো সে সত্যি-সত্যিই তা করে ফেলত।

শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং তারও অতিরিক্ত কিছু সুন্দর চক্ষুকে সুন্দরতর করে তুলেছিল। তার সারা মুখে যেন কীসের আভা ঝলমল করছিল।

আনসারের দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মাধুরী যেন বুভুক্ষুর মতো পান করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সচকিত হয়ে মেজোবউয়ের ছেলেমেয়েদের হাতে দুটো টাকা গুঁজে বললে, "এখন আসি!" বলে সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য, এবার মেজোবউও সলজ্জ হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল! আনসারের উষ্ণ করস্পর্শে তার সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। মনে হল, এই নিমিষের স্পর্শ বিনিময়ে সে আজ ভিখারিনি হয়ে গেল! সে তার সর্বস্ব লুটিয়ে দিল!

মিস জোন্স এবং পাদরি সাহেব এ সবই লক্ষ করছিল। এইবার পাদরি সাহেব একটু অসহিষ্ণু হয়েই মেজোবউয়ের ছেলেমেয়েকে আদেশের স্বরে বলে উঠল, "এই! টোমরা ও টাকা এখনই ফিরিয়ে ডিয়ে এসো।"

সঙ্গে সঙ্গে মেজোবউ বলে উঠল, "না, তোরা চলে আয়। তোদের ফিরিয়ে দিতে হবে না।" – বলেই ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সেও বেরিয়ে গেল।

পাদরি সাহেব বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মিস জোন্সকে ইঙ্গিতে ডেকে বহু পরামর্শের পর স্থির হল, মেজোবউকে শিগগিরই অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে।

মেজোবউ রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আনসার বিস্কুট কিনছে সামনের দোকান থেকে। সে একটু হাসল, সেই জাদুভরা হাসি। তারপর যেতে যেতে বলল, "কাল সন্ধ্যায় বাড়ি থাকবেন, আমি যেমন করে পারি যাব।"

আনসার হেসে বললে, "ধন্যবাদ, মিসেস হেলেন!"

মেজোবউ তিরস্কার-ভরা চাউনি হেনে চলে গেল।

আন্সারের আজ পথ চলতে চলতে মনে হল, এই ধরণির দুঃখ-বেদনা-অভাব – সব যেন সুন্দর সুমধুর! এই পৃথিবীতে দুঃখ বলে কিছুই নেই, ও-যেন আনন্দেরই একটা দিক। সুরার মতো এর আনন্দ তিক্ত জ্বালাময়। এ সুরা যারা পান করেছে, তাদের আনন্দ সুখী মানব কল্পনাও করতে পারে না। তার পকেট উজাড় করে সে আজ রাস্তার ছেলেমেয়েদের বিস্কুট বিলাতে বিলাতে এল। ওই ময়লা কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়ে – ওরা ওদের সুন্দর মায়ের সন্তান। ওই যে মেয়েটা তাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলে গেল, কী অপরূপ সুন্দরী সে। এই পৃথিবী যেন সুন্দরের মেলা! মনে পড়ল অমনই সুন্দর – তারও চেয়ে সুন্দর রুবিকে – মেজোবউকে।

তার দু চোখ দুই তারা – প্রভাতি তারা, সন্ধ্যাতারা – রুবি আর হেলেন, হেলেন আর রুবি!…

সে মানুষের জন্য সর্বত্যাগী হবে, সকল দুঃখ মাথা পেতে সহ্য করবে, তারা দুঃখী, তারা পীড়িত বলে নয়, তারা সুন্দর বলে। এ-বেদনাবোধ শুধু ভাবের নয়, আইডিয়ার নয়, এ-বোধ প্রেমের, ভালোবাসার।

মৃত্যুক্ষুধা - ২০

পরদিন যখন সন্ধ্যায় অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে তখন মেজোবউ গায়ে বেশ করে চাদর জড়িয়ে নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। কীসের যেন ভয়, কীসের যেন লজ্জা তার পা দুটোকে কিছুতেই ছাড়িয়ে উঠতে দিচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের পুরু আবরণও যেন তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে পারছিল না।

নাজির সাহেবের দ্বারে এসে হঠাৎ আনসারের স্বরে চমকিত হয়ে তার মনে হল, এখনই সে ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে বুঝি বেঁচে যায়! তার আজকার এই পরিপাটি করে বেশবিন্যাস যেন তার নিজের চোখেই সবচেয়ে বিসদৃশ - লজ্জার বলে ঠেকল। কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না।

আনসারের দৃষ্টি অনুসরণ করে লতিফা মেজোবউকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে তার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। লতিফা কিছু বলতে পারলে না, কেবল তার চোখ কেন যেন ছলছল করে উঠল। মেজোবউও তার অশ্রু আর গোপন রাখতে পারলে না।

আনসার উদাসভাবে বুঝিবা অন্ধকার আকাশের লিপিতে তারার লেখা পড়বার চেষ্টা করছিল।

নাজির সাহেবকে লতিফার হুকুমেই প্রয়োজন না থাকলেও বাইরে যেতে হয়েছিল।

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। কেবল লতিফার করতলগত হয়ে মেজোবউয়ের উষ্ণ করতল পীড়িত হতে লাগল। সে যেন হাতে-হাতে কথা কওয়া।

লতিফা ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করল, “তোমার ছেলেদের আনলে না?” মেজোবউ সেই পুরানো মধুর হাসি হেসে বললে, “না। তাহলে কি আর বসতে দিত? এতক্ষণ তার দাদির কাছে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি লাগিয়ে দিত।” বলেই একটু থেমে

আবার বললে, "কী ভয়ে ভয়েই না এসেছি ভাই। বাড়ির কাছটাতে এসে পা যেন আর চলতে চায় না।"

এইবার আনসার কথা বললে, "যাক, আপনার খুব সাহস আছে বলতে হবে। আমি তো মনে করেছিলাম আপনি আসতেই পারবেন না।"

লতিফা হেসে বললে, "দোহাই দাদু, ওকে আর 'আপনি'বলে লজ্জা দিয়ো না।" তারপর মেজোবউয়ের দিকে ফিরে বলল, "কি ভাই, তুমি বোধ হয় আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটো হবে, না?"

মেজোবউ হেসে ফেলে বললে, "আমি তোমার বড়োদিদির চেয়েও হয়তো বড়ো হব।"

আনসার হেসে বললে, "তোমাদের বয়সের হিসেবটা পরেই না হয় কোরো দাঁত-টাত দেখে। এখন কাজের কথা হোক।"

মেজোবউ একটু নিম্নস্বরে বলে উঠল, "কিন্তু কাজের কথা বলতে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে কারুর যদি বয়স ধরা পড়ে যায়?"

আনসার হেসে ফেলে বললে, "ঘাট হয়েছে আমার। এখন বলো তো তোমার মতলব কী? তুমি কী করবে?"

মেজোবউ নখ দিয়ে খানিকক্ষণ মাটি খুঁটে মুখ নিচু করেই বলল, "করব আর কী! আমার যা করবার, তা তো এখন ঠিক করে দেবে ওই সায়েব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধহয় বরিশাল বদলি করবে।"

লতিফা হয়তো একটু বেশি জোরেই মেজোবউয়ের হাত টিপে ফেলেছিল; মেজোবউ 'উঃ'করে উঠল। লতিফা হেসে বললে, "এত অল্পতে তোমার বেশি

লাগে, তবু তুমি আমাদের – তোমার এই চিরকেলে ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া, তুমি কি দারোগা-মুনসেফ যে তোমায় বদলি করবে?”

মেজোবউ কেমন একরকম স্বরে বলে উঠল, “দারোগা-মুনসেফ নই ভাই, চোরাই মাল। বদলি কথাটা ভুল বলেছিলাম, সাবধানের মার নেই, তাই একটু সামলে রাখছে আগে থেকেই।”

লতিফা হো হো করে হেসে বললে, “এরই মধ্যে চোরে-টোরে ঘরের বেড়া কাটতে আরম্ভ করেছে নাকি?” বলেই লজ্জা পেয়ে সপ্রতিভ হওয়ার ভান করে উঠে যেতে যেতে বলল, “একটু বসো, আমি একটু চা করে আনি। নইলে ওই লোকটির মেজাজকে তিনদিন ধরে জলে চুবিয়ে রাখলেও আর নরম হবে না।”

লতিফা চলে গেল। মেজোবউ গেল না, বা উঠে যাওয়ার চেষ্টাও করল না। তার সবচেয়ে বড়ো অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল তার সেদিনকার সুন্দর করে কাপড় পরার ঢংটা। সে বুঝতে পারছিল, তার যত্ন করে আঁকা বে-তিল গালে কাজলের তিলটুকুও যেন আনসার লক্ষ করছে!

আনসার হঠাৎ বলে উঠল, “তুমি আমার কথা রাখবে?”

মেজোবউ প্রথমে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত স্বরে বলে উঠল, “কিন্তু আমার ইচ্ছা থাকলেও তো রাখতে পারব না।”

আনসার মেজোবউয়ের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে, “সত্যিই কি তুমি এদেশ ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে?”

মেজোবউ আনসারের দিকে বড়ো বড়ো চোখ তুলে বললে, “আর দুদিন আগে গেলে হয়তো এত কষ্ট হত না! কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তো আমি ঘরে ফিরতে পারব না। আমি আবার মুসলমান হয়ে ফিরে আসি – আপনি হয়তো এই বলতে চাচ্ছেন, কিন্তু আমায় জায়গা দেবে কে?”

আনসার নির্বাক হয়ে বসে রইল। সত্যই তো, সে স্বধর্মে ফিরে এলে আরও অসহায় অবস্থায় পড়বে। তার শ্বশুর-বাড়ির কুটিরে তার আর স্থান হবে না। দুদিনের জন্য হলেও কথার জ্বালায় গঞ্জনার চোটে টিকতে পারব না।

হঠাৎ আনসার যেন অকূলে কূল পেল। সে সোজা হয়ে বসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তুমি এইখানেই আলাদা ঘর বেঁধে থাক – আমি ব্যবস্থা করে দেব যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে চলে যায়।"

মেজোবউ হেসে বললে, "আমায় আপনি আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন জানাজানি হলে আমাদের কী অবস্থা হবে – বুঝেছেন? আমি না হয় সইলাম সেসব, কিন্তু আপনি –"

আনসার মেজোবউয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, "সে-ভয় আমি করিনে। তা ছাড়া আমি তো এখানে চিরকাল থাকছিনে। বৎসরে-দু বৎসরে হয়তো একবার করে আসব। অবশ্য এমন ব্যবস্থা করে যাব, যাতে করে আমি যেখানেই থাকি তোমায় যেন কোনো কষ্টে না পড়তে হয়।"

মেজোবউয়ের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। এ তার দুঃখের অবসানের আনন্দে, না আনসারের অনাগত বিদায়-দিনের আভাসে – সে-ই জানে।

হঠাৎ মেজোবউ যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কান্না-কাতরকণ্ঠে সে বলে উঠল, "যাবেই যদি তবে ঋণের বোঝা চাপিয়ে যেয়ো না। আমিও কাল চলে যাই, তুমিও চলে যাও।"

বলেই সে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। আনসার একটা কথাও বলতে পারলে না। প্রস্তর-মূর্তির মতো বসে রইল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ওই দূর ছায়াপথের নীহারিকালোকের মতোই নারীর মন রহস্যময়।

মৃত্যুক্ষুধা - ২১

পরদিন সকালে না হতেই কৃষ্ণনগরে একটা হইচই পড়ে গেল! দলে দলে পুলিশ এসে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন বাড়িতে খানাতল্লাশ করতে লাগল। বহু ছাত্র ও তরুণকে হাজতে পুরল।

আনসারকে ধরবার জন্যে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ সারা রাত্রি ধরে বাগানের গাছে, নাজির সাহেবের আনাচে-কানাচে পাহারা দিচ্ছিল, ভোর না হতেই তারা ঘুমন্ত আনসারকে বন্দী করল।

শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, নাজির সাহেবের শালা আনসার রুশিয়ার বলশেভিক-চর ও বিপ্লবী-নেতা। সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল।

সবচেয়ে বেশি ঘামতে লাগলেন সেসব ভদ্রলোক, যাঁরা নিজে বা তাঁদের কোনো আত্মীয় ধরা পড়ে নাই। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "বাবা! খুব বাঁচা গেছে! যে রকম জাল ফেলেছিল পুলিশ! মনে হচ্ছিল, গুগলি শামুক পর্যন্ত বাদ দেবে না।"

ওরই মধ্যে একজন বলে উঠলেন, "আমরা চুনোপুঁটি, ওরা রুই-কাতলাই ধরতে এসেছিল!"

আর একজন আর একটু মাত্রা চড়িয়ে বললেন, "হাঁ দাদা, সরকার খলিফা ছেলে, ও ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না! মশা মারতে কামান দাগে না!"

স্বদেশ-ব্রত বীরের দল গালি খেতে লাগল, তাদের তথাকথিত হঠকারিতার জন্য – তাদেরই কাছে বেশি, যাদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার জন্য তাদের সুখের গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হতে হয়তো চিরকালের জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল এবং সবাই জানতে পারল যে, আনসার এখনও বাড়িতে বন্দী অবস্থায় আছে। দলে দলে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল নাজির সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পুলিশের মার-গুঁতো-চাবুক-লাথিতে ভ্রুক্ষেপ না করে তারা নাজির সাহেবের ঘর ঘিরে ফেললে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে দু একটা ফাঁকা আওয়াজও করলে বন্দুকের। কিন্তু কেউ এক পাও পিছুল না। ওরই মধ্যে এক বৃদ্ধ মেথর চিৎকার করে বলে উঠল, "হুজুর, আমাদের বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওর চেয়ে মার আর কী আছে? আমাদের বুকে বরং গুলি মারো, আমাদের বাবাকে ছেড়ে দিয়ে যাও।"

ওর ক্রন্দনে শুনে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না!

বাইরে জন-সংঘ ক্রন্দন-কাতর কণ্ঠে আকাশ-ফাটা জয়ধ্বনি করে উঠল! ও যেন বিক্ষুব্ধ গণ-দেবতার, পীড়িত মানবাত্মার হুংকার!

আনসারের চোখের কানায় অশ্রু টলমল করে উঠল। সে তার শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ললাটে ঠেকিয়ে জনসংঘের উদ্দেশে নমস্কার করে বলে উঠল, "আমি জানি, তোমাদের জয় হবে! তোমাদের কণ্ঠে স্বাধীন মানবাত্মার শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।"

প্রমত্ত জনসংঘকে কিছুতেই টলাতে না পেরে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আনসারের কাছে এসে বললে, "আপনি যদি কিছু বলেন ওদের, তাহলে বোধ হয় ওরা যাবে। নইলে বাধ্য হয়ে আমাদের গুলি চালাতে হবে।"

আনসার হেসে বললে, "আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু গুলির ভয়ে আমি যাচ্ছি না। গুলি যদি সত্যিই চালাবেন মনস্থ করে থাকেন, তাহলে গুলি চালান।" বলেই হেসে বললে, "আমরা গুলিখোরের জাত। ওটা ধাতে সয়ে গেছে।"

সায়েব একটু হেসে বললে, "গুলি সত্য-সত্যই চালাতে চাই না। কিন্তু আপনাকে তো থানায় যেতে হবে। ওরা আমাদের কর্তব্যকাজে হয়তো বাধা দেবে!"

আনসার তেমনই হেসে বললে, “তাহলে আপনারাও আপনাদের কর্তব্য করবেন। কিন্তু তা বোধহয় করতে হবে না। চলুন।”

শৃঙ্খলাবদ্ধ আনসারকে দেখেই উন্মত্ত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি করে উঠল। আনসার তাদের হাসিমুখে নমস্কার করে বললে, “তোমরা ফিরে যাও। ভয় নেই, আমার ফাঁসি হবে না। আবার আমি ফিরে আসব তোমাদের মাঝে।” একটু থেমে উদ্‌গত অশ্রু কষ্টে নিরোধ করে বললে, “আমার নিজের জন্য কোনো দুঃখ নেই ভাই, কারণ আমার জন্য দুঃখ করবার কেউ নেই –”

অমনই সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল, “আছে, আছে! আমরা আছি!”

আনসার হেসে বললে, “জানি, তোমরা আছ। কিন্তু তোমরা তো আমার জন্য কাঁদবার বন্ধু নও! আমি যদি পরাজিতই হয়ে থাকি, তোমরা জয়ী হয়ে আমার সেপরাজয়ের লজ্জা মুছে দেবে।”

অমনই সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, “নিশ্চয়, নিশ্চয়।”

পুলিশ সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেই আনসার বললে, “ভয় পাবেন না, আমি ওদের খেপিয়ে তুলব না, শান্তই করব।”

তারপর জনগণের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, “বন্ধুগণ! আমার বিদায়কালে তোমাদের প্রতি আমার একমাত্র অনুরোধ, তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি কিছুতেই ছেড়ো না। তোমাদেরও হয়তো আমার মতো করেই শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে, তোমরাই দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকমে কষ্ট দেবে, তবু তোমরা তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হোয়ো না। আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ কোরো না। যে বিপুল

প্রানশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্র বা নাই বলব কেন? কোচোয়ান! তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে – পশুকে তুমি চাবুক শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না! রাজমিস্ত্রি! তোমার হাতের কন্নিক দিয়ে ফুটগজ দিয়ে এত বাড়ি-ইমারত তৈরি করতে পারলে, বুনো প্রকৃতিকে রাজলক্ষ্মীর সাজে সাজালে – পীড়িত মানুষের নিশ্চিন্তে বাস করার স্বর্গ তোমরাই রচে তুলতে পারবে। আমার ঝাড়ুদার, মেথর ভাইরা, তোমরাই তো নিজেদের অশুচি অস্পৃশ্য করে পৃথিবীর শুচিতা রক্ষা করছ, নিজে সমস্ত দূষিত বাষ্প গ্রহণ করে, আয়ুক্ষয় করে, আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছ, আমাদের চারপাশের বাতাসকে নিষ্কলুষ করে রেখেছ! তোমরা এত ময়লাই যদি পরিষ্কার করতে পারলে – তাহলে এই ময়লা-মনের ময়লা মানুষগুলোকে কি শুচি করতে পারবে না? তোমাদের মতো ত্যাগী করতে পারবে না? তোমাদের ওই ঝাড়ু দিয়ে ওদের বিষ-ময়লা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না? – তুমি চাষা? তুমি যে হাল দিয়ে মাটির বুকে ফুলের ফসলের মেলা বসাও, সেই হাল দিয়ে কি এই অনুর্বর-হৃদয়, মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাতে পারবে না?

জনসংঘ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করতে লাগল। সে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিশ সাহেব বাধা দিল।

আনসার হেসে বললে, "ভয় নেই সাহেব! এ-রকম বক্তৃতা অনেক দিয়েছি, কিন্তু ওই জয়ধ্বনি ছাড়া ওদেরকে খেপিয়ে তুলতে পারিনি। আজও পারব না। খ্যাপানোর মানুষ আমার পিছনে আসছে! আমার মুখ তো বহুদিনের জন্যই এখন বন্ধ করে দেবে, যাওয়ার বেলায় না-হয় একটু আলগাই করলুম! যাক, আমি আর কিছু বলব না! এবার ওদের ফিরে যেতেই বলব!"

বলেই জনসংঘের দিকে ফিরে বললে, "আমার অনুরোধ, তোমরা ফিরে যাও। আমার পিছনে যদি যেতে হয়, তো সে পথ শুধু ওই থানাটুকু বা তারও বেশি জেল

পর্যন্ত, কিন্তু তোমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে খুঁজতে হলে স্বর্ণ-লঙ্কা পর্যন্ত যেতে হবে। স্বর্গে উঠে যেতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে।”

তারপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললে:

“এই বেচারারা তোমাদের আমাদের মতোই হতভাগ্য, দুঃখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। ওদের ক্ষমা করো, দুদিন পরে ওরাও আসবে তোমাদের কমরেড হয়ে। যে মৃত্যু-ক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমর উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে-মন্ত্র আমি কোনোদিনই শিখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার করো – সেই হবে আমারও বড়ো উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি হব মুক্ত। এসেছে, নমস্কার নাও, আমার দোষ ত্রুটি অপরাধ ক্ষমা করো, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সংঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না। আমি ভেসে চললুম দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো। নমস্কার!”

উপস্থিত সকলেই জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ললাটে কর ঠেকিয়ে সালাম ও নমস্কার করল।

পুলিশ আনসারকে নিয়ে গেল! আশ্চর্য! কেউ আর বাধা দিল না! থানাতেও গেল না! বজ্রগর্ভ মেঘের মতো ধীর-শান্ত গতিতে নিজ পথে চলে গেল।

যাওয়ার সময় সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল – লতিফাকে নিয়ে! সে কেবলই ঘন ঘন মূর্ছা যাচ্ছিল। আনসার যখন গেল তখনও সে মূর্ছিতা। আনসার নীরবে ধুলায় লুণ্ঠিতা তার ললাটে, শিরে বারবার হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, “বুঁচি, ওঠ ওঠ। তুই অমন করিসনে। আমি আবার আসব।” আনসারের অশ্রু-সাগরে যেন অমাবস্যার রাতের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!...

পরদিন প্রত্যুষে রানাঘাট স্টেশনে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় আনসার যখন গাড়িতে বদল করছিল, তখন হঠাৎ চোখ পড়ল অদূরের কয়েকটি যাত্রীর প্রতি! তারা আর কেউ নয়, মিস জোন্স, মেজোবউ, প্যাঁকালে এবং কুর্শি।

মিস জোন্স এগিয়ে এসে হাসি চেপে বললে, "আপনার এ অবস্টা ডেখে দুঃখিট, মিস্টার আনসার!"

আনসার হেসে বললে, "ধন্যবাদ! তারপর, ওদের নিয়ে কোথায যাচ্ছেন?"

মিস জোন্স বললে, "বরিশালে! আপনাদের মেজোবউ তো কাল বেঁকে বসেছিল সে আর গির্জায় থাকবে না। আবার মুসলমান হবে, ঘরে ফিরে যাবে। সে কী কান্না, মিস্টার আনসার! কিন্তু আজ সকালে দেখি, এসে বললে, –সে এদেশে থাকতে চায় না! আজ কিন্তু সারাদিন কেঁদেছে ও! ওর মাথায় বোধ হয় ছিট আছে, মিস্টার আনসার! হ্যাঁ, আর আপনি শুনে বোধহয় খুশি হবেন, কাল প্যাঁকালেও আমাদের পবিত্র ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কুর্শির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। জিশুখ্রিস্ট ওদের সুখী করুন! গুড বাই!"

ট্রেন এসে পড়ল। আনসার দেখতে পেল ইঞ্জিনের অগ্নিচক্ষুর মতোই অদূরে দুটি চক্ষু জ্বলছে। মৃত্যু-ক্ষুধার মতো সে-চাউনি জ্বালাময়, বুভুক্ষু, লেলিহান। সে-চোখে অশ্রু নাই, শুধু রক্ত।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আনসার তার চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেল, প্লাটফর্মে, কাকে যেন অনেকগুলো লোক আর মিস জোন্স ধরাধরি করে তুলছে।

রেলগাড়ির ধোঁয়ায় আনসারের চোখ এবং প্লাটফর্ম সব আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মৃত্যুক্ষুধা - ২২

সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর! সেই ধুলা-কাদার চাঁদ-সড়ক! শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই! সবাই বলে, দুদিনের জন্য চাঁদ উঠেছিল, রাহুতে গ্রাস করেছে! বলেই আশেপাশে তাকায়। "বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য রাজকুলেষু!"

সেই 'ওমানকাৎলি'পাড়া, সেই বাগান, পুকুর, পথ-ঘাট, কোঁদল-কাজিয়া সব আছে আগেকার মতোই। শুধু যারা কিছুতেই ভুলতে পারে না তারা ছাড়া আর সকলেই মেজোবউ, কুর্শি, প্যাঁকালে, আনসার - সবাইকে, সব কিছুকে ভুলে গেছে। স্মরণ রাখার অবকাশ কোথায় এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মাঝে!

অগাধ স্রোতের বিপুল আবর্তে পড়ে যে হাবুডুবু খেয়েছে, সে-ই জানে কেমন করে আবর্তের মানুষ এক মিনিট আগে হারিয়ে-যাওয়া তারই কোলের শিশু-সন্তানের মৃত্যু-কথা ভুলে আত্মরক্ষা চেষ্টা করে!

নিত্যকার একটানা দুঃখ-অভাব-বেদনা-মৃত্যুপীড়া-অপমানের পঙ্কিল স্রোতে, মরণাবর্তে যারা ডুবে মরছে, তাদের অবকাশ কোথায় ক্ষণপূর্বের দুঃখ মনে করে রাখার? ওরা কেবলই হাত-পা ছুঁড়ে অসহায়ের মতো আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত।

কিন্তু জীবনের সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে যে মৃত্যুর মুখে নিশ্চিন্তে আত্মসমর্পন করে, এই শেষ নির্ভরতার চরম মুহূর্তে বুঝি-বা তারও স্মরণ-পথে ভিড় করে আসে - সেই চলে-যাওয়ার দল -যারা সারা জীবন তারই আগোপিছে তার প্রিয়তম সহযাত্রী ছিল।

শোকে জরায়-অনাহারে দুঃখে প্যাঁকালের মা শয্যা নিয়েছে। সে কেবল বলে, "দেখ বড়োবউ, জন্মে অবধি এমন শুয়ে থাকার সুযোগ আর আরাম পাইনি ... কাল থেকে এই একপাশেই শুয়ে আছি, মনে হচ্ছে এ ধারটা পাথর হয়ে গিয়েছে, তবু কী আরামই না লাগছে! ... আর কারুর জন্যই ভাবি না, তোদের জন্যেও না,

আমার জন্যেও না, কারুর জন্যেও না! ... খোদা যা করবার করবেন! পানিতে লাঠি মেরে তাকে কেউ ফিরাতে পারে না! যা হওয়ার, তা হবেই!" – বলেই সে নিশ্চিন্ত-নির্বিকার চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে! হঠাৎ সে দার্শনিক হয়ে ওঠে, দুঃখ ভোলার বড়ো বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয় – যা জীবনে তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। বলেই সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রশান্ত হাসিতে মুখ-চোখ ছলছল করে ওঠে। ও যেন সারা রাত্রি ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পোড়া তৈলহীন প্রদীপের সলতের মতো নিববার আগে হঠাৎ জ্বলে ওঠা!

বড়োবউ চোখ মোছে। জল এলেও মোছে, না এলে লজ্জায় চোখ ঢাকার ছলনায় মোছে।

ওইটুকু তো দুটো চোখ, কত জলই বা ওতে ধরে! যে রক্ত চুঁয়ে ওই চোখের জল ঝরে, সেই রক্তই যে ফুরিয়ে গেছে।

মেজোবউয়ের পরিত্যক্ত সন্তান দুটি আঙিনায় খেলা করে; কেমন যেন নির্লিপ্তভাব ওদের কথায়-বার্তায় চলাফেরায় চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

মাতৃহারা বিহগ-শাবক যেমন অন্য পাখিদের সঙ্গে থেকেও দলছাড়া হয়ে ঘুরে ফেরে, কী যেন চায়, কাকে যেন খোঁজে – তেমনই!

খানিক খেলা করে, খানিকক্ষণ কাঠ কুড়োয়, খানিক অলস ভাবে গাছের তলায় পড়ে ঘুমোয়, ঘুমিয়ে উঠে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে, তারপর বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে। ঘরে এসেই কাকে যেন খোঁজে, কী যেন প্রত্যাশা করে, পায় না। বড়োবউয়ের ছেলেমেয়েরা ভাব করতে আসে, ভালো লাগে না। বড়োবউ আদর করতে আসে, কেঁদে ওরা হাত ছাড়িয়ে নেয়। অকারণ আখোট করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা আস্তে আস্তে রুগ্‌ণা শয্যাশায়ী দাদির কাছে এসে বসে। ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলে, "দাদিমা, আজ ভালো আছিস?" বৃদ্ধা হেসে বলে, "আর

দাদু, ভালো! এখন চোখ দুটো বুজলেই সব ভালো মন্দ যায়।” তারপর দার্শনিকের মতো শান্তস্বরে বলে, “দেখ দাদু, আমি চলে গেলে তোরা কেউ কাঁদিস না যেন। মানুষ জন্মালেই মরে। ছেলেমেয়ে, মা-বাপ কারুর কি চিরদিন থাকে?”

শ্রীমান দাদু এ-সবের এক বর্ণও বোঝে না, হাঁ করে চেয়ে থাকে।

মা-বাপের নাম শুনতেই ঢুলতে ঢুলতে খুকি বলে ওঠে, “দাদি, তুই আব্বার কাছে যাবি? আচ্ছা দাদি, আব্বা যেখানে তাকে সেইখেন বেশিদূর, না, মা যেখানে থাকে সেই বরিশাল বেশি দূর?”

শান্ত বৃদ্ধা ছটফট করে ওঠে। একটা ভীষণ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে পাশ ফিরে শুয়ে বলে, “ওই বরিশালই বেশি দূর, ওই বরিশালিই বেশি দূর!”

খুকি বুঝতে পারে না। তবু ক্লান্ত-কণ্ঠে বলে, “তাহলে আমি আব্বার কাছে যাব। আচ্ছা দাদি, আব্বার কাছে যেতে হলে কয়দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়! তুই তো বিছানায় শুয়ে অসুখ করেছিস, তারপর সেখানে যাচ্ছিস! আমারও এইবার অসুখ করবে, তারপর আব্বার কাছে চলে যাব! মা ভালোবাসে না, খেরেস্তান হয়ে গিয়েছে! হারাম খায়! থুঃ! ওর কাছে আর যাচ্ছি না, হুঁ হুঁ! ”

বৃদ্ধা শুয়ে শুয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। মনে হয়, কামারশালে বুঝি পোড়া কয়লা জ্বালাতে হাপরের শব্দ হচ্ছে!

দাওয়ার মাটিতে শুয়ে পড়ে জড়িতকণ্ঠে খুকি আবার জিজ্ঞাসা করে, “হেঁ দাদি, আব্বা যেখানে থাকে সেখানে সন্ধ্যাবেলায় কী খেতে দেয়। আমি বলি দুধ-ভাত, হান্‌পে বলে গোশ্‌ত-রুটি!”...কিন্তু দাদির উত্তর শোনার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ে!

ছেলেটি জেগেই থাকে। কী সব ভাবে, মাঝে মাঝে রান্নাঘরের দিকে চায়। সেখানে অন্ধকার দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না।

কিন্তু থাকতেও পারে না। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায়! দাদি চেঁচিয়ে ওঠে, "অ হান্‌পে, কোথায় যাচ্ছিস রে এই অন্ধকারে?" অন্ধকারের ওপার থেকে আসে, "মসজিদে শিন্নি আছে, আনতে যাচ্ছি।"

বড়োবউ মসজিদের দ্বার থেকে কোলে করে আনতে চায়, সে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বলে, "যাব না, আমি শিন্নি খাব, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে গো! আমি যাব না।"

মসজিদের ভিতর থেকে মউলবি সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোরানের সেই অংশ – যার মানে – "আমি তাহাদের নামাজ কবুল করি না, যাহারা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয়!" মউলবি সাহেব জোরে জোরে পাঠ করেন, ভক্তরা চক্ষু বুজিয়া শোনে!

অন্ধকার ঘরে ক্ষুধাতুর শিশুর মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায় – আসন্ন মৃত্যুর ছায়ার মতো!

ঘুমের মাঝে খুকি কেঁদে ওঠে, "মাগো আমি আব্বার যাব না! আমি তোর কাছে যাব, বরিশাল যাব!"

খন্ড অন্ধকারের মতো বাদুর দল তেমনই পাখা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর। – রাত্রি শিউরে ওঠে!

মৃত্যুক্ষুধা - ২৩

বহুদিন পরে লতিফার মুখে হাসি দেখা দিল। নাজির সাহেব অফিস থেকে এসেই ঘুমন্ত লতিফাকে তুলে বললেন, ‘ওগো, শুনেছ? রুবির যে নদিয়ার ডিস্ট্রিক্ট-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন!”

এক নিমেষে লতিফার ঘুম যেন কোথায় উড়ে গেল! সে ধড়মড়িয়ে উঠে বললে, “সত্যি বলছ? মিস্টার হামিদ একা এলেন, না, রুবিও সঙ্গে আছে?”

ধরাচূরা খুলতে খুলতে নাজির সাহেব বললেন, “তা তো ঠিক জানিনে। তবে কে যেন বললে, হামিদ সাহেবের ছেলেমেয়েরাও এসেছে সঙ্গে।”

লতিফার চোখ কার কথা ভেবে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল! মনে মনে বলল, “সেই তো এলি হতভাগি, দুদিন আগে এলে হয়তো একবার দেখতে পেতিস!”

পরদিন বিকালে লতিফার দোরে একটা প্রকান্ড মোটর এসে দাঁড়াল। লতিফা দোরে এসে দাঁড়াতেই মোটর হতে এক শ্বেতবসনা সুন্দরী হাস্যোজ্জ্বল মুখে নেমে এল।

লতিফা তাকে একেবারে বুকের ওফর টেনে নিয়ে বললে, “রুবি, তুই! তুই এমন হয়েছিস?” বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগাল।

রুবি ধমক দিয়ে বললে, ‘চুপ! কাঁদবি তো এখনই চলে যাব বলে দিচ্ছি! মাগো! তোদের চোখের জল যেন সাধা ; কোথায় এতদিন পরে দেখা, একটু আনন্দ কর, তা না, কেঁদেই ভাসিয়ে দিলি?”

লতিফা চোখ মুছে বললে, “সেই রুবি, তুই এই হয়েছিস! তখন যে তোর মতন কাঁদুনে কেউ ছিল না লো আমাদের দলে, আর এখন এমনই পাথর হয়ে গেছিস?”

রুবি লতিফার গাল টিপে দিয়ে বললে, "পাথর নয় লো, বরফ! আবার গ্রীষ্মকাল এলেই গলে জল হয়ে যাব!" বলেই তার ছেলেমেয়েদের আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে নিয়ে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে, তারপর মিষ্টি, কাপড় দিয়ে ভুলিয়ে – বাড়িটাকে যেন সরগরম করে তুললে!

পাড়ার অনেক মেয়ে জুটেছিল, কিন্তু রুবির এক হুমকিতে সব যে যেখানে পারল সরে পড়ল! বাপ! ম্যাজিস্টরের মেয়ে!

রুবি হেসে বলল, "জানিস বুঁচি, আমি বেশি লোক দেখতে পারিনে! একপাল লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ভাবতেও যেন অসোয়াস্তি লাগে। ওদের তাড়িয়ে দিতে কষ্ট হয়, কিন্তু না তাড়িয়ে যে পারিনে ভাই।"

বুঁচি ওরফে লাতিফা হেসে বললে, " তুই ম্যাজিস্টেটের মেয়ে, তাই ওরা অমন চুপ করে সরে গেল, নইলে এমন ভাষায় তোর তাড়নার উত্তর দিয়ে যেত যে, কানে শীল-মোহর করতে ইচ্চে করত।"

রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বললে, "তাহলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস এতদিনে?"

লতিফা হেসে ফেলে বললে, " হ্যাঁ, তা আমি কেন, আমার ছেলেমেয়েরাও শিখে ফেলেছে। এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু ও কথা যাক, ছেলেমেয়েগুলোকে ছেড়ে একটু স্থির হয়ে বস দেখি, কত কথা আছে জানবার, জানাবার। যেতে কিন্তু বেশ দেরি হবে তোর। মোটর এখন ফিরে যেতে বল, রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাবি। "

রুবি আনন্দে ছেলেমানুষের মতো নেচে উঠে সোফারকে গাড়ি নিয়ে যেতে বলল এবং ঝিকে ওই সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে তার মাকে ভাবতে মানা করে রাত্রি দশটায় গাড়ি আনতে বলে দিল।

রুবি ছুটে এসে লতিফার পালঙ্কের উপর সশব্দে শুয়ে পড়ে লতিফাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "বাস, এইবার আর কোনো কথা নয়। তুই তোর সব কথা বল, আমি আমার সব কথা বলি।" বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "ও বাব, এখুনই আবার তোর নাজির সাহেব আসবে বুঝি! ওকে কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে বাইরে ভাগিয়ে দিবি।"

তার কথা বলার ধরনে লতিফা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, "দাঁড়া, মিনসে আসুক তখন তোকে ধরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ছি। কিন্তু ভয় নেই তোর, আজ উনি শিকারে বেরিয়েছেন। ফিরতে রাত বারোটার কম হবে না।"

রুবি লতিফার পিঠ চাপড়ে বললে, "ব্রাভো! তবে আজ আমাদের পায় কে! গ্র্যান্ড গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।"

লতিফা হেসে বললে, "গল্প করলে তো পেট ভরবে না। তার চেয়ে বরং চল রান্নাঘরে, আমি পরোটা করব, আর তুই গল্প করবি।"

রুবি হেসে বললে, "তাই চল ভাই, কতদিন তোর হাতের রান্না খাইনি।"

পরোটার নেচি করতে করতে রুবি বললে, "আমি কী করে তোর খবর পেলুম জানিস, বলেই একটু থেমে বলতে লাগল, "একদিন কাগজে পড়লুম, তোদের বাড়িতে মি. আনসারকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে!" বলেই রুবি হঠাৎ চুপ করে গেল।

লতিফার হাসিমুখ হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমিও তোর কথা প্রথম শুনি দাদ-ভাইয়ের কাছে! দাদু এখন রেঙ্গুনে স্টেট- প্রিজনার হয়ে বন্দী আছেন, শুনেছিস বোধহয়!"

রুবি তার ডাগর চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে লতিফার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বললে, "হ্যাঁ জানি। খবরের কাগজে সব পড়েছি। আচ্ছা ভাই বুঁচি, আনু ভাই তোকে কিছু বলেছিল আমার সম্বন্ধে?"

লতিফা শান্তকণ্ঠে বলল, "হাঁ, বলেছিল! আচ্ছা রুবি আমার কাছে লুকোবিনে, বল?"

রুবি স্থিরকণ্ঠে বলে উঠল, "দেখ ভাই বুঁচি, আমি আমার মনের কথা কারুর কাছেই গোপন রাখিনে। এর জন্য আমায় চরম দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু মনকে চোখ ঠারতে পারিনি। তুই যা জিজ্ঞাসা করবি তা জানি!"

লতিফা রবির দিকে খানিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই তোর স্বামীকে ভালোবাসতিস?"

রুবি সহজ শান্তকণ্ঠে বলে উঠল, "না। সে তো আমার ভালোবাসা চায়নি, আমিও চাইনি। সে চেয়েছিল আমাকে বিয়ে করে ধন্য করার দাবিতে বিলেত যাওয়ার পথ-খরচা। তা সে পেয়েও ছিল। কিন্তু কপাল খারাপ, সইল না, বেচারার জন্য বড়ো দুঃখ হয় বুঁচি।" একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "মৃত্যুর দিন-কতক আগে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। এই ভুলই হয়তো তার কাল হল। আমি সেবা-শুশ্রষা সবই করেছি, অবশ্য আমাকে খুশি করতে নয়, তাকে আর আমার বাপ-মাকে খুশি করতে। কিন্তু একদিন সে ধরে ফেলল আমার ফাঁকি! সে স্পষ্টই বলল, "তুমি আমায় ভালোবাস না, এর চেয়ে বড়ো দুঃখ আমার আর নেই রুবি। আমার সবচেয়ে কাছের লোকটিই আমার সবচেয়ে অনাত্মীয়, এ ভাবতেও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হয়তো আমি বাঁচতুম, কিন্তু এর পরেও আমার বাঁচবার আর কোনো সাধ নেই।"

লতিফার যেন শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল। সে আর বলতে না দিয়েই প্রশ্ন করল, "এ শুনেও তুই চুপ করে রইলি?"

রুবি তেমনই সহজভাবে নেচি করতে বলল, “তা ছাড়া আর কি করব বল? একজন ভদ্রলোককে চোখের সামনে মরতে দেখলে কার না কষ্ট হয়! কিন্তু সে কষ্ট কোনদিনই আত্মীয়-বিয়োগের মতো পীড়াদায়ক হয়নি আমার কাছে।”

লতিফা চমকে উঠল। যেন হঠাৎ সে গোখরো সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলছে ! কিন্তু ইচ্ছা করেই সে এর পরেও আর কোনো প্রশ্ন করল না। তার মনে হতে লাগল, সে যেন ক্রমেই পাষাণ-মূর্তিতে পরিণত হতে চলেছে। যা শুনল, যা দেখল, তা যেন কল্পনারও অতীত। এমন নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি কোনো মেয়েলোকে করতে পারে, ভাবতেও তার যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসতে লাগল।

রুবি অদ্ভুত রকমের হাসি হেসে বলে উঠল, “শুনে তোর খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর, না? তা আমার বাপ-মাই ঘেন্না করেন, তুই তো তুই। কিন্তু বুঁচি, তুই শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবি যে, যেদিন আনু ভাইকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে, কাগজে পড়লুম, সেদিনই মনে হল, আমার সুন্দর পৃথিবীকে কে যেন তার স্থূল হাত দিয়ে তার সমস্ত সৌন্দর্য লেপে-মুছে দিয়ে গেল! ওই একটি ছাড়া, পৃথিবীতে আর কারুর জন্যই আমার কোনো দুঃখ-বোধ নেই।”

বলতে বলতে তার স্থির-তীব্র চক্ষু অশ্রুভারে টলমল করে উঠল।

লতিফ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে উঠল, “কিন্তু ভাই, এ কি মস্ত বড়ো অন্যায় নয়?”

রুবি চোখের জল মুছবার কোনো চেষ্টা না করে ততোধিক শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, “আমার হৃদয়-মনকে উপবাসী রেখে অন্যের সুখের বলি হতে না পারাটাই বুঝি খুব বড় অন্যায় হয় তোদের কাছে, বুঁচি? হয়তো তোদের কাছে হয়, আমার কাছে হয় না। আমার ন্যায়-অন্যায় আমার কাছে। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে সব কিছু উপদ্রব নীরবে সইতে পারাটাই কিছু মহত্ত্ব নয়! আমার বাপ-মার স্নেহ-ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে গিয়েই তো আমি আজ এমন দেউলিয়া! আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনের আনন্দের পথ বেছে নেওয়ার আমারই কোনো অধিকার থাকবে না ?” বলেই নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললে, “আমার স্বামী মহৎ ভাগ্যবান এবং বুদ্ধিমান লোক

ছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে সারা জীবন দুঃখ পাওয়ার দায় থেকে বেঁচে গেলেন।”

লতিফার মনে হতে লাগল পৃথিবী যেন টলছে। তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। কোনোরকমে কষ্টে সে বলতে পারল, “মেয়েমানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর হয়, আমি যে ভাবতেই পারছিনে রুবি! কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে!”

রুবি এইবার হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু সে হাসিতে কোনো রসকষ নেই। ততক্ষণে নেচি তৈরি করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে হাত ধুতে ধুতে বলল, “দেখ বুচি, পানি চমৎকার শীতল পানীয় দ্রব্য, কিন্তু সেই পানি যখন আগুনের আঁচে টগবগ করে ফুটতে থাকে, এখন তা গায়ে পড়লে ফোসকা তো পড়বেই! – কিন্তু তোর তাওয়ায় যে ধোঁয়া উঠে গেল, নে, এখন পরোটা কটা ভেজে নে!”

লতিফা যন্ত্র-চালিতের মতো পরোটা হালুয়া চা তৈরি করে রুবির সামনে ধরল।

রুবি হেসে বলল, “এসব কিছু আমি বাড়িতে খাইনে, আজ তোর কাছে খাব।”

লতিফা বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না।

রুবি হেসে বলল, “নে, খা এখন। এ সবের মানে তুই বুঝবিনে। দেখছিস তো, আমি থাকি হিন্দু-বিধবাদের মতো। একবেলা খাই, তাও আবার নিরামিষ। ঘি খাইনে, চা, পান তো নয়ই। সাদা থান পরি, তেল দিইনে চুলে। এই সব আর কী! এখন বুঝলি তো?”

খেতে খেতে হেসে ফেলে বলল, “যে স্বামীকেই স্বীকার করল না, তার আবার বৈধব্য! আমারই তো হাসি পায় সময় সময়!”

লতিফা একটু ক্রুদ্ধস্বরেই বলে উঠল, "হাঃ, বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে ভাই রুবি।"

রুবি সে কথার উত্তর না দিয়ে চা খেতে খেতে বলল, "আঃ, এই একটু চা পেলে আনু ভাই কেমন লাফিয়ে উঠত আনন্দে, দেখেছিস!"

লতিফা এইবার হাঁফ ছেড়ে বেঁচে বলে উঠল, "সত্যি ভাই রুবি, দাদু বোধ হয় তোর চেয়েও চায়ের কাপকে বেশি ভালোবাসে!"

রুবি গভীর হওয়ার ভান করে বলে উঠল, "তার কারণ জানিস, বুঁচি? চায়ের কাপটা যত সহজে মুখের কাছে তুলে ধরা যায়, আমায় যদি আমনি করে হাতে পেয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে পান করতে পেত তোর দাদু, তাহলে আমিও ওই চায়ের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠতুম !" বলেই হেসে ফেললে।

লতিফা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, "ওমা, তুই কি বেহায়াই না হয়েছিস রুবি! একেবারে গেছিস!"

রুবি সায় দিয়ে বলে উঠল, "হাঁ, একেবারেই গেছি, আর ফিরব না।"

চা খাওয়া হলে রুবি বলে উঠল, "শুধু একজনের জন্য ওই চা-টার ওপর লোভ হয়!"

রুবির অতিরিক্ত প্রগলভতায় ক্ষুব্ধ হয়ে লতিফা বলে উঠল, "এতই যদি তোর লোভ, তাহলে চা-খোর লোকটাকে বেঁধে রাখলিনে কেন ? তাহলে সেও বাঁচত, তুইও বাঁচতিস। আমরাও বাঁচতাম।"

রুবি বিনা-দ্বিধায় বলে উঠল, "একটা ভুল বললি ভাই বুঁচি। আমরা হয়তো বেঁচে যেতুম সত্যি, কিন্তু তোর দাদু বাঁচত না।"

রুবি লতিফার হাতে কটাস করে টিমটি কেটে দিয়ে বলল, “মর নেকি! তাও বুঝলিনে।” তারপর একটু থেমে বলল, “যে মরেনি তার আবার বাঁচা কি! তোর দাদু তো আমার মতন মরেনি। দিব্যি জ্বলজ্যান্ত বেঁচে থেকে কুলিমজুর নিয়ে মাঠে-ঘাটে চরে খাচ্ছে। আমার একটা বড়ো দুঃখ রইল ভাই, যার জন্যে মরলুম, তাকে মেরে যেতে পারলুম না।”

লতিফা কতকটা কূল পেয়ে হেসে ফেলে বললে, “বাপ রে! কী দস্যি মেয়ে তুই! শোধ না নিয়ে যাবিনে ! তা তোকে একটা খোশখবর দিচ্ছি ভাই। সে হয়তো মরেনি তোর মতো, কিন্তু ঘা খেয়েছে।”

রুবি একেবারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, “না, না, এ হতেই পারে না! ও শুধু মানুষের বাইরের দুঃখকেই দেখেছে, ভিতরের দুঃখ দেখবার ওর ক্ষমতা নেই, হৃদয় বলেই কোনো কিছুর বালাই নেই ওর! ও শুধু তাদেরই দুঃখ বোঝে, যারা ওর কাছে কেবলই পেতে চায়। যে তাকে তার সর্বস্ব দিয়ে – চেয়ে নয়, সুখী হতে চায়, তার দুঃখ ও বোঝে না, বোঝে না।”

খুলে-পড়া এলোচুলের মাঝে রুবির চোখ আঁধার বনে সাপের মানিকের মতো জ্বলতে লাগল।

লতিফার চোখ দুঃখে, আনন্দে, গর্বে ছলছল করে উঠল। তার দাদুকে এমন করে ভালোবাসারও কেউ আছে। সে রুবিকে একেবারে বুকে চেপে ধরে শান্তস্বরে বলল, তোর অভিমানের কুয়াশায় কিছু দেখতে পাচ্ছিনে রুবি, আমিও তো মেয়ে মানুষ। আমি সত্যি বলছি, সে তোকে ভালোবাসে।”

রুবির চোখের বাঁধ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দগ্ধ দুপুরে বর্ষা নামার মতো।

লতিফা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, “আমার দুঃখ হচ্ছে রুবি, ভালোবাসার এই অতলতার সন্ধান পেলে তার কারাবাসও বেহেশ্‌তের চেয়ে মধুর

হয়ে উঠত। তুই ভালোবাসিস শুধু এইটুকুই সে জানে। তার তল যে এত গভীর, তা বোধহয় জানে না।” বলেই রুবির গাল টিপে হেসে বলল, “জানলে দেশসেবা ছেড়ে দিয়ে কোনদিন তোর পদসেবা শুরু করত।”

রুবি কিন্তু এর পরে একটি কথাও কইল না। অতল পাথরের ঝিনুক যেমন দিনের পর দিন ভেসে বেড়ায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে, একবিন্দু শিশিরের আশায়, স্বাতী নক্ষত্রের শিশিরের আশায়, তারপর সেই শিশিরটুকু বুকে পেয়েই সে জলের অতল তলে ডুবে যায় মুক্তা ফলাবার সাধনায় – এ-ও তেমনই।

“সেও ভালোবাসে” শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতেই যেন রুবির বুক ভরে উঠল। শুধু এই একবিন্দু শিশিরের প্রতীক্ষাতেই যেন সে তার তৃষ্ণার্ত মুখ তুলে অনির্দেশ শূন্যের পানে তাকিয়ে ছিল। তার বুক ভরে উঠেছে। তার মুখের বাণী মূক হয়ে গেছে। সে আর কিছু চায় না। এইবার সে মুক্তা ফলাবে। সে অতল তলে ডুবে গেল।

ঝিনুকের মুখে একবিন্দু শিশির! নারীর বুকে একবিন্দু প্রেম!

আকাশের এক কোণে এক ফালি চাঁদ! কোন মাসের চাঁদ জানে না, তবু রুবির মনে হতে লাগল, ও যেন ঈদের চাঁদ! ওর রোজার মাস বুঝি শেষ হল আজ!

আকাশের কোলে একটুকু চাঁদ, শিশু-শশী। ও যেন আকাশের খুকি। সাদা মেঘের তোয়ালে জড়িয়ে আকাশ-মাতা যেন ওকে কোলে করে আঙিনায় দাঁড়িয়েছে।

অমনি খুকি...

লজ্জায় রুবির মুখ ‘রুবি’র মতোই লাল হয়ে উঠল। এ কী স্বপ্ন! এ কী সুখ!

মৃত্যুক্ষুধা - ২৪

বরিশাল। বাংলার ভিনিস!

আঁকাবাঁকা লাল রাস্তা। শহরটিকে জড়িয়ে ধরে আছে ভুজ-বন্ধের মতো করে।

রাস্তার দু-ধারে ঝাউগাছের সারি। তারই পাশে নদী। টলমল টলমল করছে - বোম্বাই শাড়ি-পরা ভরা-যৌবন বধূর পথ-চলার মতো। যত না চলে, অঙ্গ দোলে তার চেয়ে অনেক বেশি।

নদীর ওপারে ধানের খেত! তারই ওপারে নারিকেল-সুপারি কুঞ্জঘেরা সবুজ গ্রাম, শান্ত নিশ্চুপ। সবুজ শাড়ি-পরা বাসর-ঘরের ভয়-পাওয়া ছোট্ট কনে-বউটির মতো।

এক আকাশ হতে আর-আকাশে কার অনুনয় সঞ্চরণ করে ফিরছে, “বউ কথা কও। কথা কও।”

আঁধারের চাঁদর মুড়ি দিয়ে তখনও রাত্রি অভিসারে বেরোয়নি। তখনও বুঝি তার সান্ধ্য প্রসাধন শেষ হয়নি। শঙ্কায় হাতের আলতার শিশি সাঁঝের আকাশে গড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চেয়ে আকাশটাই রেঙে উঠেছে বেশি। মেঘের কালো খোঁপায় তৃতীয়া চাঁদের গোড়ে মালাটা জড়াতে গিয়ে বেঁকে গেছে। উঠোনময় তারার ফুল ছড়ানো।

তিন-চারটি বাঙালি মেয়ে কালাপেড়ে শাড়ি পরা, বাঁকা সিঁথি, ‘হিল-শু’ পায়ে দেওয়া, ওই রাস্তারই একটা ভগ্নপ্রায় পুলের উপর এসে বসল! মাথার ওপর ঝাউ শাখাগুলো প্রাণপণে বীজন করতে লাগল।

মাঝে মাঝে স্থানীয় জমিদারদের দু একটি মোটর-ফিটন যেতে যেতে মেয়েগুলির কাছে এসে গতি শ্লথ করে আবার চলে যেতে লাগল !

একটি মেয়ে ছাড়া আর সকলে মশগুল হয়ে গল্প জুড়ে দিল। একলা মেয়েটি একটু দূরে নেমে ঘাসের ওপর বসে একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল, জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে নিজেই বলতে পারত না।

অনেকক্ষণ গল্প-গুজবের পর দলের একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “মেজোবউ, ওখানে একলাটি বসে কার কথা ভাবছ ভাই?”

মেজোবউ উত্তর দিল না।

মেয়েটি তখন উঠে গিয়ে তাকে একটু জোর করেই নিজেদের কাছে এনে বসিয়ে হেসে বললে, “জান, মেম-সায়েবের হুকুম তোমাকে চোখে চোখে রাখার! সরে পোড়ো না ভাই যেন, তাহলেই গেছি!”

মেজেবিউ ম্লান হাসি হেসে বললে, “না, সে ভয় নেই। আর সরে পড়লেও তো ওই নদীর জল ছাড়িয়ে বেশি দূর যাব না!”

অস্তমান তৃতীয়া চাঁদের মুখ ম্লান হয়ে উঠল তার হাসিতে। ঝাউগাছগুলো জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

যে মেয়েটি কথা বলছিল, তার নাম মিনতি।

মেজোবউয়ের প্রায় সমবয়সী। হিন্দুঘরের বউ ছিল সে। স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে খ্রিস্টান হয়ে ডাইভোর্স নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে বেড়ায়।

লেখাপড়া না-জানা মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীরও কাজ করে।

এই মেয়েটিই মেজোবউয়ের একমাত্র বন্ধু। চোখের জল বদল-করা সই।

অন্য দুটি মেয়ের একজন বলে উঠল, “আচ্ছা ভাই, ওর মেজোবউ নাম কি আর ঘুচবে না?”

মেজেবিউ হেসে বললে, "তালগাছ না থাকলেও তালপুকুর নামটা কি বদলে যায় ?"

তেমনই জোর-করা হাসি! বুকের সলতে জ্বালিয়ে প্রদীপের আলো দেওয়ার মতো।

মিনতি মেজোবউকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বলে উঠল, "তা ভাই, ওকে ওই নামে ডাকতেই আমার তো বেশ মিষ্টি লাগে। মনে হয় বেশ ঘরসংসার করে জা-ননদ মিলে সব আছি!"

অন্য মেয়েটি কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুর করে গেয়ে উঠল, "হায় গৃহহীন, হায় গতিহারা!" তারপর কথায় একটু নুন-লঙ্কা মিশিয়ে বললে, "তা ভাই, তোমাদের ঘরের সাধ এখনও মেটেনি। তা দুধ খাওয়ার সাধই যদি জেগে থাকে, এ ঘোল খেয়ে খামোখা সর্দি করছ কেন?"

মেজেবিউ ঝালটুকু সয়ে নিয়ে বলল, "তা ভাই, মাথায় ঘোল ঢালার চেয়ে পেটে ঘোল ঢালা বরং সইবে!"

মেয়েটির গোপন দুর্বলতায় ঘা দিল গিয়ে এই ওস্তাদি মারটুকু। সে মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, "মেজোবউ কথা শিখেছে দেখছি।"

মেজোবউ হেসে বললে, "তার চেয়ে বলো মানুষ হয়ে উঠলাম। আমরা কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না! মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়ে! কিন্তু তুমি রেগো না ভাই, আমি সত্যিই তোমাদের সঙ্গে মিশতে পারবার মতো হইনি। এই তো জোর করে ফ্যাশন করে শাড়ি পরাচ্ছ, বাঁকা সিঁথি কেটে দিচ্ছ, জুতোও মিলল কপালে, কিন্তু ও জুতো-শাড়ি দিয়েও কি তোমাদের মতো করে তুলতে পারলে! মেম-সায়েবদের জুতো মেম-সায়েবদের মাথায় থাক ভাই, আমি সাদা কাপড় পরে থাকতে পারলেই নিশ্বাস ফেলে বাঁচি !"

মেয়েটি একটু তীক্ষ্ম স্বরে বলে উঠল, “তাহলে এখানে এলে কেন?” তার এই খাপছাড়া প্রশ্নে সে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে উঠল এবং সেই কারণেই ততোধিক রেগে গেল।

মেজোবউ তেমনই হাসিমুখে বলল, “আমি তো মেম-সায়েব হতে আসিনি ভাই, মানুষ হতেই এসেছিলুম। আলো-বাতাস প্রাণের বড়ো অভাব আমাদের সমাজে, তাই খাঁচার পাখির মতো শিকলি কেটে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কিছু যে ভালো হয়নি আমার, তা বলব না। এখন যা শিখেছি, তাতে করে যেখানেই থাকি দুটো পেটের ভাত জোগাড় করবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু কী করি, চিরজন্মের অভ্যেস, ওই জুতোটুতোগুলো পরলে মনে হয় পায়ে এ এক নতুন রকমের শিকলি পড়ল!”

মিনতি উঠে পড়ে বলল, “আচ্ছা, এইবার থেকে তুমি লুঙ্গি পরে থেকে, আমি বলে দেব গিয়ে! জুতোটুতো তোমার পোড়া কপালে সইবে না! এখন চলো, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে।”

সকলে উঠে পড়ল। ...

একটু না যেতেই প্যাঁকালের সঙ্গে দেখা হল। সে পাদরি সাহেবের সুপারিশের জোরে এখানে এসেই ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের পিয়োন পদ লাভ করেছে। এখন আর সে প্যাঁকালে নয়, তার নাম এখন জোসেফ ! ম্যাজিস্ট্রেট ডাকে, ‘জোসেফ আনন্দে প্যাঁকালে প্রায় কেঁদে ফেলে! ‘হুজুর’ বলে পড়ি কি মরি বলে ছুটে এসে আড়াই হাত লম্বা এক কুর্নিশ ঠোকে। শ্রীমতি কুর্শি ওরফে মিসেস প্যাঁকালে মিশনারি মেমদের ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়, তার জন্য কুড়ি টাকা করে পায়। প্যাঁকালের পনেরো আর কুশির কুড়ি, মোট পঁয়ত্রিশ। দিব্যি হেসেখেলে সংসার চলে। কুর্শি প্যাকালেকে বড়ো একটা কেয়ার করে না, সে পাঁচ টাকা বেশি রোজগার করে। প্যাঁকালে কিছু বললে বলে, “আমি তোর খাই নাকি রে মিনসে? বেশি টকখাই টকখাই করিসনে।” বলে গরব করে চলে যায়।

প্যাঁকালে না খেয়েই আফিসে চলে যেতে চায়। বলে, "আমি ম্যাজিস্টারের পিয়োন। তোর মতন কত বিশ টাকা আমার কাছার তলায় ঝোলে। তোর মেমসায়েবকে শুধোয় কে!"

ঘরের বাইরে পা দিতেই কুর্শি কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বলে, "যা দিকিন দেখি !" বলেই খপ করে কোঁচাটা ধরে ফেলে। বলে, "আর এক পা এগুবি তো কেলেঙ্কারি বাধিয়ে দেব। কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেব!" বলেই কোঁচায় হ্যাঁচক টান দেয়।

প্যাঁকালে অসহায় অবস্থায় সেখানে বসে পড়ে, বলে, "ছেড়ে দে বলছি শালি ! নইলে দিলুম ধুমাধুম। ... হেই কুর্শি, তোর পায়ে পড়ি। কেউ দেখতে পাবে এখুনি! আল্লার কিরে! জিশুখ্রিস্টের কিরে! মাইরি বলছি, আর কখনও কিছু বলব না।" বলেই নাকে কানে হাত দেয়।

কুর্শি কোঁচা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বসে পড়ে। বলে, "চল, খাবি! খেয়ে তোর ম্যাজিস্টর খসমের কাছে গিয়ে রাগ দেখাস।"

বারো-আনা দিগম্বর প্যাঁকালে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে । তারপর খেয়েদেয়ে গুড়গুড় করে আফিসে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায়, "শালার মেয়ে-মানুষকে বিয়ে করার মতন গুখুরি কাজ আর নেই! তোকে যদি আর কখনও বিয়ে করি, আমার বাপের –"

কুর্শি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। বলে, "আসতে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করবি, তাহলে আজ মেম-সায়েবদের কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব।"

সেদিন রাস্তায় মেজোবউকে দেখে পূর্ব অভ্যাসমতো বলে উঠল, "মেজো-ভাবি, তোমাকেই খুঁজছি আমি।"

মেজেবিউ হেসে বললে, "কেন, কুর্শি কি আজও তাড়িয়ে দিয়েছে? আচ্ছা কুকুরে-ভালোবাসা তোমাদের যা-হোক!" বলেই পুরানো দিনের মতো মিষ্টি করে হাসে। অন্ধকার মেঘে বিজলির ক্ষণিক ছটা!

ওই হাসির মানে আগে প্যাঁকালে বুঝত না। কিন্তু এখন সে ঝানু হয়ে না গেলেও ডাঁশিয়ে উঠেছে, কাজেই ও হাসিতে, বেশ একটু যেন চমকে ওঠে। আঁধার রাতে বিজলি আর সাপ দুটোই চমকে দেয়।

প্যাঁকালে একটু থেমে তার পাশের মেয়েগুলোর দিকে আধা-কটাক্ষে চেয়ে নিয়ে বললে, "বাড়ির থেকে একটা চিঠি এসেছে, বিকেলে তুমি যদি একটু পড়ে দিয়ে আসো।"

মেজোবউকে কে যেন হঠাৎ চাবুক মারলে, চমকে উঠল সে! মুখ কেমন হয়ে গেল, আবছা আঁধারে ভালো দেখা গেল না। কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হল, কে যেন তার টুঁটি টিপে ধরেছে।

মেজেবউ শক্ত মেয়ে। তবু সে আজ আর সামলাতে পারল না। কম্পিত দীর্ঘ কণ্ঠে বলে উঠল, "চলো, এখনই তোমার বাড়ি চলো।"

প্যাঁকালে বলতে যাচ্ছিল, "আজ আর না-ই গেলে, কাল –"

তাঁকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে মেজেবিউ প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, "না, না, এক্ষনি চলো !" বলেই সে প্রায় ছুটে প্যাঁকালের বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তার সঙ্গে যে আর কেউ ছিল, বা তাদের কোনো কিছু বলবার দরকার, সেসব ভাববারও যেন অবসর ছিল না তার।

মিনতি প্যাঁকালেকে বলে দিল, সে যেন মেজোবউয়ের চিঠি পড়া হলেই তাকে সঙ্গে করে রেখে দিয়ে যায়।

দূরে থেকে দেখা গেল, মেজেবিউ তেমনই বেগে ছুটেছে ঘরের পথে।

হাউই যেমন বেগে আকাশে ওঠে, তেমনই বেগেই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

মৃত্যুক্ষুধা - ২৫

মেজোবউ ঝড়ের মতো প্যাঁকালের ঘরে এসে ডেকে উঠল, ‘কুর্শি’ !

মেজোবউয়ের এমনতর স্বর কুর্শি কখনও শুনে নাই। সে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেজেবিউ বললে, “কী চিঠি এসেছে দেখি!”

কুর্শি নিঃশব্দে চিঠি এনে দিল। তারও তখন পা কাঁপছে! তারা আসা অবধি এই এক বছরের মধ্যে কারুর কোনো চিঠি পায়নি। হঠাৎ আজ বিয়ারিং চিঠি দেখে সকলেই মনে করছিল, না জানি কার কোনো দুঃসংবাদ আছে এতে!

মেজেবিউ হেরিকেনের কাছে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঠি খুলে খানিকটা পড়েই একেবারে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে উঠল, “খোকা! খোকা! বাপ আমার!”

ততক্ষণ প্যাঁকালে এসে পড়েছিল। সে আসতেই মেজোবউ একেবারে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে বলে উঠল, “আমার খোকা বুঝি আর বাঁচে না ভাই! সে তার এই পোড়াকপালি মাকে দেখতে চায়। আমায় নিয়ে চলো, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমায় নিয়ে চলো!” বলেই সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

প্যাঁকালে, কুর্শি বহু কষ্টে মূর্ছা ভাঙালে।

আজ এক বৎসর ধরে বরিশাল এসেছে ওরা। এর মধ্যে কেউ কোনো চিঠি দেয়নি। মেজোবউ কীসের যেন আতঙ্কে কৃষ্ণনগরের নাম পর্যন্ত শুনলে পালিয়ে যেত। তার কেবলই মনে হত, এই বুঝি তার খোকা-খুকির অসুখের খবর এসে পড়ল। সে দিনরাত প্রার্থনা করত, ওরা ভালো থাক, বেঁচে থাক, কিন্তু কোনো চিঠি যেন কোনো দিন না আসে। কিন্তু সোয়াস্তিও ছিল না তার, সে ঘুমে-জাগরণে - সব সময় যেন তার ক্ষুধাতুর শিশুদের কান্না শুনতে পেত। সে রাক্ষুসী! ইচ্ছা করেই ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছিল। চলে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল! তাকে এদেশ ছেড়ে

যেতে হবে, শুধু এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। সে যে মা, সে-কথা সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মেজেবউ আবার সমস্ত চিঠিটা পড়ল। প্যাঁকালের মা চিঠি লিখছে – লিখছে মানে কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। খোকার অর্থাৎ মেজোবউয়ের ছেলের ভয়ানক অসুখ, টাইফয়েড। বোধ হয় বাঁচবে না। যে ছেলে এক বছর ধরে ভুলেও তার মায়ের নাম মুখে আনেনি, সে আজ বিকারের ঘোরে কেবলই বলছে, "আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল!" প্যাঁকালের মাও মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু মরবার আগে সে যেন যার ছেলে তার হাতেই দিয়ে যেতে পারে। ছেলের কান্না শুনে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, আর ওর রাক্ষুসী মা-র মন গলবে না!

সেইদিন রাত্রেই মেজোবউ, প্যাঁকালে, কুর্শি কৃষ্ণনগর যাত্রা করল। যাওয়ার আদেশ পেতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মিশনারি কর্তারা মেজোবউকে ভালো করেই চিনতেন! কাজেই তারা আপত্তি করলেও যাওয়া বন্ধ করতে সাহস করলেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার যখন গাঢ়তর হয়ে আসছে, সেই সময় তারা কৃষ্ণনগর স্টেশন এসে পৌঁছল। এই একটা বছরের মধ্যে কত পরিবর্তনেই না হয়ে গেছে এর! মেজোবউয়ের শোকাচ্ছন্ন চোখের মলিন দৃষ্টির ম্লানিমা লেগে স্টেশনের কয়লা-রঞ্জিত পথ যেন আরও কালো হয়ে উঠল। তার মনে হল, কে যেন তার স্থূল হাতের কর্কশ পরশ বুলিয়ে সেই পূর্বের কৃষ্ণনগরের সব সৌন্দর্য মুছে নিয়ে গেছে।

একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠেই মেজোবউ বললে, "খুব জোরে হাঁকাও।" এতক্ষণ এত দুর পথে আসতে যে হৃৎস্পন্দনের চঞ্চলতা তাকে অধীর করে তোলেনি, স্টেশনে নেমেই তার চঞ্চলতা যেন শতগুণে বেড়ে উঠল। একবার মনে হল, এ রাস্তায় যেন শেষ না হয়। এই গাড়ি যেন এই রকম করে অনন্তকাল ধরে ছুটতে থাকে।...হয়তো এতক্ষণে তার খোকার মুখে 'মা'ডাক নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

কোচোয়ানের চাবুক খেয়ে ঘৃত-পক্ক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেটুকু স্পিড বাড়ালে, তাকে ঘোড়া-দৌড় ঠিক বলা চলে না, সে কতকটা খোঁড়া-দৌড়! তাতে যেমনই হাসি পায়, তেমনই অসহায় জীব গুলির প্রতি করুণায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু ঘোড়ার চেয়েও আর্তনাদ করতে লাগল গাড়ির চাকাগুলো। তারা যেন আর গড়াতে পারে না। পথের বুকে মুখ ঘষে ঘষে যেন তাদের প্রতিবাদ-ক্রন্দন জানাতে থাকে। রাস্তাও তেমনই। যেন দাঁত বের করে মিউনিসিপ্যালিটিকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে!

ঢিকুতে ঢিকুতে গাড়ি এসে প্যাঁকালেদের বাড়ির দোরে লাগল। ভিতর থেকে কোনো শব্দ শোনা গেল না। ভিতরে কেউ আছে বলেও মনে হল না। একটা মৃৎ-প্রদিপের ক্ষীণ-শিখার আশ্বাসও নেই সেখানে।

মেজোবউয়ের বুক অজানা আশঙ্কায় হা হা করে উঠল! তার অন্তরে যেন অনন্ত আকাশের শূন্যতায় রিক্ত আর্তনাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে টলতে টলতে গাড়ি থেকে নেমে দোরের গোড়ায় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠল, ‘খোকা! ’

কে যেন তার টুঁটি চেপে ধরেছে।

শূন্য ঘরের বুক থেকে কার যেন ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল! ও আর্তনাদ যেন এপারের নয়, সাঁতরে পার-হওয়া নদীপারের শ্রান্ত যাত্রীর।

প্যাঁকালে ততক্ষণে বন্ধ ঘরের আগড় খুলে ঢুকে পড়েছে। তার পায়ে কঙ্কালের মতো কী একটা ঠেকতেই সে চিৎকার করে উঠল, ‘মা! মা!’

হঠাৎ রান্নাঘরের দোর খুলে গেল; এবং তার ভিতর থেকে বড়োবউ বেরিয়ে এসে ভয়াতুর শীর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ‘কে?’

মেজোবউয়ের মূর্ছাতুর কণ্ঠে আর একবার শুধু একটু অস্পষ্ট অনুনয় ধ্বনিত হল, “খোকা, আমার খোকা কই?”

বড়োবউ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, “রাক্ষুসি, এতদিনে এলি! খোকা নেই! কাল সকালে সে চলে গেছে!”

মেজোবউ ‘খোকা’বলে আহত বিহগীর মতো সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল!... প্যাঁকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, “বড়োবউ, কী ভীষণ অন্ধকার! আর সহ্য করতে পারছিনে, বাতি, বাতি কই?”

বড়োবউ তেমনই কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, “বাতি নেই! সব বাতি নিবে গেছে! ঘরে এক ফোঁটা তেল নেই।”

প্যাঁকালে উন্মাদের মতো ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে উঠল, “তা হলে ঘরই পুড়ুক!”

সেই রক্ত-আলোকে দেখা গেল, প্যাঁকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণ চামড়াটুকু নিয়ে তখনও ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়!

প্যাঁকালে ‘মা’বলে তার মায়ের বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পেক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্য!

চালের খড় তখনও ধুধু করে জ্বলছে, ওদেরই বুকের আগুনের মতো। একটু পরে সে অগ্নিশিখাও যেন অতি শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মৃত্যুক্ষুধা - ২৬

পাড়ার লোকে মেজোবউকে দেখলেই বলে, “ও রাক্ষুসি! ওর বুকে শুধু লোহা আর পাথর!”

খোকা চলে গেছে। মেয়ে পটলিকে নিয়ে মেজোবউ আবার আগের মতো পান খেয়ে রেশমি চুড়ি পরে, বাঁকা সিঁথি কেটে, চওড়া কালো-পেড়ে শাড়ি পড়ে কস্তা-পেড়ে হাসি হেসে পাড়া বেড়ায়।

মাত্র মাস খানেক হল ছেলে মরেছে।

মূর্ছাভঙ্গের পরই মেজোবউ উন্মাদিনীর মতো তার ছেলের যা কিছু স্মৃতি-চিহ্ন যেখানে ছিল, মায় শতছিন্ন কাঁথাটি পর্যন্ত, - সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে! তাও ওই সঙ্গে পুড়িয়েছে।

তার হৃদয়ের সমস্ত শোক-জ্বালাকেও যেন ওইদিনই চিরদিনের মতো ভস্মীভূত করে দিয়েছে। তারপরে নিজেই সে আগুন নিবিয়েছে কলসি কলসি চোখের জল ঢেলে! আজ যেন তার আর কোনো শোক নেই, কোন দুঃখ-গ্লানি নেই! চোখের জলও যেন ওই সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে!

এ যেন তার আর এক জন্ম! সে যেন নবজন্মের নতুন লোকের নতুন মানুষ।

মেয়ে পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়, তার যত্ন নেয় না। ও যেন ওর মেয়েই নয়। কেউ বলে, শোকে পাগল হয়েছে, কেউ বলে রসের পাগল!

ওই ঘরেই সে থাকে, মিশনারি সাহেব-মেমদের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে সেখানে যায়নি, কিন্তু আবার তৌবা করে মুসলমানও হয়নি।

প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটি কুড়ি টাকার চাকুরি জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কল্‌মা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। কুর্শির বাবা মধু ঘরামি অনেকদিন আগেই মারা গেছে। কাজেই কুর্শিও খানিক কেঁদে-কেটে শেষে প্যাঁকালের ধর্মকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং ওদের দিন বেশ একরকম চলে যাচ্ছে।

শুধু মেজোবউ যেন ঘরে থেকেও ঘরের কেউ নয়! এর-ওর বাড়ি যায় এবং যায় একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই ধোপা-দোরস্ত হয়ে! কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকে তাকে একখানা চৌকি এগিয়ে দেয়। তাদের ধারণা, মেজোবউ এই এক বছরে না জানি বহু সাহেব-কাপ্তেন পাকড়ে টাকার কুমির হয়ে এসেছে! দুঃখ-ধান্ধা করে খায়, কাজেই আগের থেকে একটু মুখের ভাবটা থাকলেও হয়তো বা কালে-কবুসে হাত পাতলে কোনো না দুটো টাকা পাওয়া যাবে!

সত্যি-সত্যিই মেজোবউ কিছু টাকা জমিয়েছিল, কিন্তু সে দু একশো মাত্র, ওর বেশি নয়। তাই সে বিবিয়ানি করে উড়াচ্ছে, এরপর কী হবে, বা কী করে চলবে, সে চিন্তাও যেন সে করে না।

তার টাকার লোভে বাড়ির লোকেও কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

পাড়ার মোড়ল হিসিবি লোক, অনেক চিন্তার পর সে স্থির করলে যে, পাড়ার কোনো মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারকে মুসলিম করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। কাজেই সে মউলবি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না এ নিয়ে। কী জানি, যদিই বেশি টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়!

কেউ কিছু বললে মোড়ল হেসে বলে, "বাবা, এখন দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। যাবে কোথা? একটু চরে খাক, তারপর ঘরের গাই ঘরে ফিরে আসবে! "

মোড়লের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে তারা ফিরে যায়।

মেজোবউ লতিফার কাছেই যায় সব চেয়ে বেশি করে। লতিফা যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ, তাতে করে সে চিরকাল হৃদয়টাকেই বড়ো করে দেখতে শিখেছে। মেজোবউয়ের ভিতরে যে আগুন সে দেখেছিল, তাকেই সে শ্রদ্ধা করে। কাজেই তাকে স্বধর্মে ফেরানো নিয়ে কোনোদিনই পীড়াপীড়ি করেনি! নাজির সাহেব বেচারা একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ। এ নিয়ে ওঁর কোনো মাথা-ব্যথাই নেই। শুধু লতিফাকে রহস্যের ছলে এ নিয়ে একটু চিমটি কাটেন মাত্র। বলেন, "দেখো গো, শেষে তুমিও যেন আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে আমায় অকূলে না ভাসাও!"

লতিফা হেসে বলে, "তুমি তো ভাসবার মতো হালকা নও, তোমার বরং ডুববারই বেশি ভয়। তা সে দিক ভয় আমারই বেশি! আমিই তো খাল কেটে বেনোজল আর কুমির দুই-ই ঘরে আনছি!"

নাজির সাহেব নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "নাঃ! ডুববার মতোই বপুটা ক্রমেই স্থূল হচ্ছে বটে! এইবার থেকেই রাত্তিরে উপোস দিয়ে এ বরবপু একটু হালকা করতে হবে – অন্তত ভেসে যাবার মতো!"

লতিফা নাজির সাহেবের গায়ে থুতকুড়ি দিয়ে কটাস করে রাম-চিমটি কেটে বলে, "ষাট! বালাই! তোমায় কে মোটা বলে! তার চোখে ভ্যালার আঠা দিয়ে দেব!"

নাজির সাহেব 'উহু উহু'করে ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলেন, "বাপ রে বাপ! আগে জানলে কে এ সূর্পনখাকে বিয়ে করত..."

সেদিন সকালে উঠেই মেজোবউ হঠাৎ বলে উঠল, "বড়ো-বু! আমি আজ পাড়ার সমস্ত ছেলেদের খাওয়াব!"

বড়োবউ বুঝতে না পেরে বললে, 'কেন?'

মেজোবউ সহজ কণ্ঠে বললে, "আজ খোকার চালশে।"

বড়োবউয়ের দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সত্যিই তো আজ চল্লিশ দিন হল খোকা চলে গেছে! মেজোবউ তাহলে ভোলেনি। ভুলবার ভান করে মাত্র। বড়োবউ চোখের জল মুছে বলে উঠল, "তা তোর ছেলের নামে খাওয়াবি, ওতে আমাদের কী বলবার আছে ভাই! কিন্তু একবার পাড়ার মোড়ল আর মউলবি সাহেবকে তো বলতে হয়।"

মেজোবউ তেমনই শান্তকণ্ঠে বললে, "না ওদের কাউকে বলব না। শুধু ছোটো ছোটো খোকাদের ডেকে নিজে রেঁধে খাওয়াব।"

বড়োবউ কেঁদে ফেলে বললে, "ওরে পাগলি! মোড়ল না বললে, কেউ যে তার ছেলেকে তোর হাতের রান্না খেতে দেবে না!"

মেজোবউ একটু থেমে বলে উঠল, "ওঃ আমি যে খ্রিস্টাননি। তা যে করেই হোক, আমি খাওয়াবই!" বলেই সে কিছু না বলে মোড়লের বাড়ি হাজির হল।

মোড়ল দেখলে, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। এই সুযোগ ছাড়লে তবে আর ঘরে ফেরানো যাবে না। সে খুব ভালোমানুষ সেজে বললে, "তা কী করব বল মা, তুই তো আমার মেয়ের মতোই। খ্রিস্টানের হাতে আমি বললেও কেউ খাবে না! মরে গেলেও না।"

মেজোবউয়ের দগ্ধ-চোখে সহসা যেন অশ্রুর পুঞ্জীভূত মেঘ ঘনিয়ে এল। তার মনে পড়ল কতদিন নিরাহারে কাটিয়ে তার খোকা চলে গেছে! তার সমস্ত মন যেন হাহাকার করে আর্তনাদ করে উঠল। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠে সামনের উঠানে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগল, "আমি আজই মুসলমান হব! আমার খোকার আত্মা যেন চিরকালের ক্ষুধা নিয়ে না ফিরে যায়!

মোড়ল যেন হাতে চাঁদ পেল। সে তখনই উঠে মেজোবউকে তুলে বলল, "এই তো মা, এতদিনের মানুষের মতো, মায়ের মতো কথা বললি। তোর খোকা মরবার

সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, ‘মা, তুই খেরেস্তান, তোর হাতের পানি খাব না।’তুই মুসলমান না হয়ে ওর ফাতেহা না দিলে ওর শাস্তি হবে।”

মেজোবউ দুই কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠল, “আর ওর নাম কোরো না আমার কাছে। ওর কোনো কথা বোলো না। আজ পাড়ার সব ছেলেই আমার খোকা।”

মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বললে, “তাই হোক! ওরাই তোর খোকা হোক। ওদেরে খাইয়ে, কোলে করে তুই তোর খোকার শোক ভোল।”

মেজোবউ চলে গেলে মোড়ল আপন মনেই বলে উঠল, “রাক্ষুসি হলেও মা তো। নাড়ির টান যাবে কোথায়?”

মৃত্যুক্ষুধা - ২৭

পাড়ার প্রায় শতাধিক ক্ষুধাতুর শিশুকে পরিপাটি করে মেজোবউ খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করে যখন লতিফার বাড়ি এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে রুবির প্রকাণ্ড মোটরকার দাঁড়িয়ে।

কী যেন এক নিবিড় প্রশান্তিতে আজ মেজোবউয়ের বুক ভরে উঠেছে। ওই সব ক্ষুধাতুর শিশুদের খাওয়াতে, তাদের প্রত্যেকেরে আদর করতে কোলে করতে করতে তার মনে হচ্ছিল, তার খোকা হারাইনি! সে এই ক্ষুধাতুর শিশুদের মাঝেই শত শিশুর রূপ ধরে এসেছে! তাদের আদর করে খেয়ে চুমু খেয়ে বুকে চেপে তার সাধ যেন আর মিটতে চায় না। যে খোকাকে দেখে, তার মুখেই সে তার খোকার মুখ দেখতে পায়! আজ যেন সে জগজ্জননি!

সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল ও তারা নয়, ওর খোকা! ওই দূরলোকে থেকে তার মাকে ফিরে পেয়ে হাসছে। ওই আকাশের মতো বিরাট উদার খোকার মায়ের কোল।

এক আকাশ-মাতার কোলে শত-সহস্র তারা–খোকা-খুকি!

সন্ধ্যাতারার পাশেই চতুর্থী তিথির চাঁদ। ও যেন খোকার বাঁকা হাসি। ও যেন খোকার ডিঙ্গি। খোকা বাণিজ্যে বেরিয়েছে – তার মাকে রাজরানি করবার দুঃসাহসে মণিমাণিক্য আনতে শূন্যে পাড়ি দিয়েছে। না, না – ও যেন খোকার হাতে ছেনি-দা! দুষ্টু ছেলে দা হাতে গহন বনে পালিয়েছে, তার দুঃখিনি মায়ের জন্য কাঠ কেটে আনবে। না, না– ও মায়ের জন্যে ওই শূন্যে ঘর তুলছে মেঘের ছাউনি দিয়ে! আকাশে আকাশে সারাদিন খেলা করে ফিরবে, পালিয়ে বেড়াবে, তারপর সন্ধ্যাবেলায় ওইখানটিতে ওই উঠোনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি এসেছি, আমি হারিয়ে যাইনি।'

মেজোবউয়ের চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠতেই তার মনে হল, ওই তারার চোখও যেন ঝিকমিক করে উঠেছে! খোকার চোখে জল! না, না, আর কাঁদবে না সে! ও যে সকল দেশের সকল লোকের সকল মায়ের খোকা সে! ও কি কারুর একলার? এক মার কাছে এসেছিল, আদর পায়নি, আর এক মায়ের কাছে চলে গেছে! তবু তো সে আছে! ওই তারা, ওই চাঁদে, ওই আকাশের কোথাও না কোথাও সে আছেই আছে! যেখানে খুঁজি, সেখানেই যে ওকে দেখতে পাই! দুষ্টু ছেলে, কখনও ভিখারিনির কোলে খিদের ছল করে কাঁদে, কখনও পিতৃমাতৃহীনের ছল করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বেড়ায়, কখনও মারহাট্টা মায়ের ওপর রাগ করে পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে, কখনও দুলালি মায়ের কোলে সোনাদানা পরে হাসে। ও কি খোকা, ও যে সর্বগ্রাসী, রাক্ষস! সমস্ত বিশ্বকে ও যে ওর রূপ দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে।...

মেজোবউ হাসতে হাসতে বসে পড়ে বলল, "এই মাত্তর খোকাদের খাইয়ে এলুম। ওদের খাওয়াতে বড্ড দেরি হয়ে গেল ভাই, তাই আজ আর আসতে পারিনি! যা সব দুষ্টু ছেলে!"

একী অপূর্ব কণ্ঠস্বর। এ কী প্রশান্ত গভীর স্নেহ! সকলের মন যেন জুড়িয়ে গেল।

মেজোবউ এমন করে কথগুলি বলল পারল না! শুধু রুবির চোখে ফেটে জল এল! সে মনে মনে মেজোবউকে নমস্কার করে বলল, "তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভয়ের সাগর উতরে গেছ!"

লতিফা বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করে বসল, "কার খোকা মেজোবউ?"

রুবি জোরে লতিফার হাত টিপে দিতেই তার হুঁশ হল। সে ভুলেই গেছিল যে আজ মেজোবউ তার খোকার নামে পাড়ার খোকাদের খাওয়ালে! তার এই অমার্জনীয় ভুলের জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। না জানি মেজোবউয়ের শোকার্ত মাতৃহৃদয়ে কত ব্যথাই সে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি এদিক থেকে মন

ফেরাবার জন্য সে বোকার মতো বলে উঠল, “আজ দাদাভাইয়ের চিঠি পেলাম কি-না ভাই, তাই মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে! তাই হুঁশ ছিল না।”

মেজোবউ শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, “ওঁর খুব অসুখ বুঝি?”

লতিফা অবাক হয়ে বলে উঠল, “হাঁ, তা তুমি কী করে জানলে?”

মেজোবউ হেসে বলে উঠল “ভয় নেই, তিনি আমায় চিঠি দিয়ে জানাননি, এমনি কেন যেন মনে হল।”

রুবির চোখ নিমেষের তরে যেন জ্বলে উঠল। সে লতিফার কাছে শুনেছিল, মেজোবউয়ের নাকি ওদিক দিয়ে একটা গোপন দুর্বলতা আছে। কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে! কাজেই তার জ্বলে-ওঠা চোখকে এক নিমিষে নিবিয়ে ফেলতে দেরি হল না। তার ওপর শোকার্ত মাতৃহৃদয়কে এদিক দিয়ে আঘাত করবার মতো নির্মমতাও তার ছিল না।

রুবি কিছু বলবার আগেই মেজোবউ বলে উঠল, “আমি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের সকাল-সন্ধ্যে একটু করে পড়াব মনে করেছি তা তুমি তো ভাই ম্যাজিস্টর-এর মেয়ে, তোমার বাবাকে বলে এই পাড়াতেই একটা ছোটো ঘর তুলে দিতে বলো না। অবশ্য ঘর না পেলে আপাতত আমাকে আমাদের উঠানের সামনে বাগানটাতেই পাঠশালা বসাতে হবে। কিন্তু বর্ষা এলে তখন কী করা যাবে?”

রুবির মনের ঝাঁঝটুকু কেটে গেল, এই হতভাগিনির এই সান্ত্বনা খোঁজার ছল দেখে। তার বুঝতে বাকি রইল না যে, ও সকল ছেলেকে ভালোবেসে নিজের ছেলের শোক ভুলতে চায়। সে খুশি হয়ে বলল, “নিশ্চয়ই বলব আব্বাকে। আর তিনি যদি কিছু না-ই করেন, আমি তোমার পাঠশালার ঘর তুলে দেব। শুধু ঘর তোলা নয়, নিজে এসে সাহায্যও করে যাব হয়তো!”

মেজোবউ বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে না। কিন্তু তার চোখ জলে ভরে এল। সে একটু চুপ করে থেকে দুই হাত তুলে ললাটে ঠেকালে। সে-নমস্কার তার রুবিকে, না কাকে উদ্দেশ করে তা বোঝা গেল না!

লতিফা বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো এতক্ষণ বসেই ছিল। ও যেন এর কিছুই বুঝতে পারছিল না। ওর মন ছিল ওর ঘর-ছাড়া দাদুটির চিন্তায় – তার জন্য বেদনায় ভরপুর। মেজোবউ এসে পড়ার পর থেকে যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রুবির সঙ্গে তা এমন হঠাৎ চাপা পড়ল দেখে সে একটু ছটফট করতে লাগল – অবশ্য মনে মনে। তার ওপর, ছেলে মরার শোক ও জানে না, কিন্তু না জেনেই ওর ভীতু মন ও শোকের কথা ভাবতেও যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। ও শোকের যেন কল্পনাও করা যায় না। সে আর থাকতে না পেরে যেন এই শোকাবহ প্রসঙ্গটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই বলে উঠল, “আচ্ছা, মেজোবউ! তুমি একটা বুদ্ধি বাতলে দিতে পার? অবশ্য তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়ার সময় এ নয়। তবু মনে হয়, তুমি যেন এর একটা মীমাংসা করতে পারবে।”

মেজোবউ নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে লতিফার দিকে চাইল।

লতিফা বলে যেতে লাগল, “আজ সকালে দাদাভাই-এর একখানা চিঠি পেয়েছি রেঙ্গুন জেল থেকে। সেই নিয়েই রুবির সঙ্গে আলোচনা চলছিল। যাক, চিঠিখানা তুমি দেখোই না, তাহলে সব বুঝতে পারবে।”

মেজোবউ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল–।

রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল

চিরআয়ুষ্মতীসু!

স্নেহের বুঁচি। পাঁচ-ছ মাস পরে তোদের চিঠি দিচ্ছি। সব কথা লিখতে পারব না – লিখবার অধিকার নেই! লিখলেও উপরতলার তাকে এমন করে নিশ্চিহ্ন করে

দিবেন যে, স্যার জগদীশ বসুও কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উদ্ধারসাধন করতে পারবেন না। তা ছাড়া আমার স্বভাব তো জানিস, আমি বলে যেতে পারি অনর্গল, কিন্তু লিখতে হয় অর্গলবদ্ধ হয়ে। তাতে করে মন আর হাত দু-ই ওঠে হাঁপিয়ে। অবশ্য হাঁপানি আমার এখনও আরম্ভ হয়নি – যদিও বুকে টিউবারকিউলোসিসের জার্ম্ কিছুদিন থেকে তার নীড় রচনা করেছে। সে-খবর অনেক আগেই খবর-কাগজের মারফতে হয়তো প্রচার হয়ে গেছে এবং তা তোরও শুনতে বাকি নেই।

তুই তো শুধু আমার বোনাই নস, তাই বন্ধু। তাই আজ তোকে এমন অনেক কথা বলব, যা তোর কাছেও কোনোদিন বলিনি।

তুই তো জানিস, আমার বুকে পোকার খাবার মতো কোনো খাদ্য ছিল না। কিন্তু ওটা যে সংক্রামক, তাও আমার অজানা ছিল না। একদিন পোকা-খাওয়া বুকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। শুনলাম, সে-পোকা নাকি আমারই কাঁটার বেড়া থেকে উড়ে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছে।

বড়ো দুঃখ হল। কিন্তু আমার কোনো হাত ছিল, না! থাকলেও সে-হাত বন্ধক রেখেছিলাম পুলিশের হাত-কড়ার কাছে, কাজেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হল।

কিন্তু প্রভুভক্ত পোকা আমায় ভুলতে পারলে না। এত সি. আই. ডি., এত পুলিশ প্রহরীর নজর এড়িয়ে – সমুদ্দুর ডিঙিয়ে পোকা আমার বুকে ফিরে এল। অন্যের বুক কতটা খেয়ে এসেছে, তা তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা এবং সতেজ দংশন থেকেই বুঝতে পারলাম।

অবশ্য আমার আর কোনো পোকাকেই ভয় নেই। বিলিতি পোকা, দিশি পোকা, বুকের পোকা, দুঃখের পোকা – তা সে যে পোকাই হোক। কিন্তু আমার না থাকলেও কর্তাদের আছে। তাঁরা আমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলা-গোছ – ছাড়তেও পারে না, গিলতেও পারে না।

মৃত্যুক্ষুধা

আজ ঘুম থেকে উঠেই খোশ-খবর শোনো গেল। আমায় নাকি কাল ছেড়ে দেওয়া হবে। অবশ্য ছেড়ে দেওয়া মানে, দম নিতে দেওয়া। মরিস যদি বাবা, তো ঘরে গিয়ে মর, আমাদের দায়ি করে যাসনে – এই মনোভাব আর কী!

এরা সত্যই সিংহের জাত। পশু হয়েও পশুরাজ স্পেসিসের। আধ-মরা রোগ-জীর্ণ শিকার এরা খায় না।

আবার পুরুষ্টু হয়ে উঠলেই ক্যাঁক করে ধরবে!…

আমি ঠিক করেছি, ছাড়া পেলেই ওয়ালটেয়ারে ছুড়ে যাব। আমি চাই – এই বন্ধনের পরে নিঃসীম মুক্তি। মাথায় অনাবৃত আকাশ, চোখের সামনে কূলহারা তটহারা জলধি, মনের সামনে নিরবিচ্ছিন্ন অনন্ত একা – একা আমি!

মাঝে মাঝে মনে হয় –মনে হয় ঠিক না, লোভ হয় – যাওয়ার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই – জেনে যাই! আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে সাদা মেঘের ছায়া নয়-কালো মেঘের ছায়া-ঘন মায়া দেখে যাই।

তোরই চিঠিতে জেনেছি, সে-মেঘ নাকি তোরই দেশে গিয়ে জমেছে। তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে? তুই হয়তো বলবি এবং শুনে মেঘও হয়তো বিদ্যুৎহাসি হেসে বলবে, হাতের কাছে যার থাকবে সমুদ্দুর, সে চায় দু-ফোঁটা মেঘের জল! সংস্কৃত কবিদের একটা চির-চলিত উপমার কথা মনে পড়ছিল, তা আর লিখলাম না! না লিখলেও বুঝবি বলে।

মানুষ যখন প্রগলভ হয়-অর্থাৎ সোজা কথায় বিকারগ্রস্ত হয়ে বকতে থাকে, তখন তার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে – এ-কথা ডাক্তার না বললেও সকলে বোঝে। আমার বেলায়ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

আমার যাবার বেলায় আমার শেষ কথা বলে গেলাম এইজন্যে যে, বলবার অসর জীবনে হয়তো আর হবে না।

আমি জীবনে কোনো-কিছুতেই নিরাশ হইনি। জীবনের বেলাতেও হতাম না – যদি না বুঝতাম যে, বাঘে ধরেও যাকে উগলে দেয় – তার দুরবস্থা কতদূর গিয়ে পৌঁচেছে! রক্ত মাংসের পরিমাণ তার কত কমে এসেছে! – কিন্তু এ কী ক্ষুধা আমার? এই কি মৃত্যু-ক্ষুধা?

আমি যদি না-ই ফিরি, দুঃখ করিসনে ভাই। আমরা তো ফেরার সম্বল নিয়ে বেরোইনি। তাই ফেরারি আসামি হয়েই কাটিয়ে দিলাম। আমাদেরই পথের পথিক যারা রয়ে গেল – তাদের মাঝেই আমায় দেখতে পাবি। এই কারায়, এই ফাঁসিমঞ্চে আমরা তো আজই এসে দাঁড়াইনি, আমাদের কণ্ঠে শত লাঞ্ছনার রক্ত-লেখা হয়তো আজও মুঝে যায়নি। নইলে এমন সুখের নীড়ে আমার মন বসল না কেন? পিঞ্জরের দ্বার ভেঙে মুক্ত লোকের ঊর্ধ্বে উড়ে গান গাওয়ার এ সাধ কেন জাগল? জীবনকে আমরা জীবিতের মতোই ব্যয় করে গেলাম, মৃতের মতো কার্পণ্য করে কাক-শকুনের খাদ্য করিনি! আমার যা সম্ভবনা, তা যেন কোনোদিন তোর অগৌরবের না হয়ে ওঠে।

অন্যলোকে গিয়ে যদি এ-লোকের প্রিয়জনকে মনে রাখবার মতো অবসর থাকে, সেথা গিয়ে অনশন-কারাবন্দী না হই, তাহলে বিশ্বাস করিস – তুই আমার মনে থাকবি।

খোকাদের চুমু দিস! নাজির সাহেবকে ফাইন্যাল গুঁতো! তুই আদর-আশিস নে। রুবি ও মেজোবউ আমার নমস্কার জানাস। ইতি –

তোর দাদু

চিঠি পড়ে মেজোবউ যে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলে, তা মানুষের মুখ নয়। ও যেন ঝরার একটু আগের শিশির-সিক্ত রক্ত- কমল!

লতিফা মুগ্ধনয়নে দেখতে লাগল। রুবির চোখ যেন পুড়ে গেল!

মেজোবউয়ের কিছু বলবার আগেই রুবি লে উঠল, “আমি ঠিক করেছি বুঁচি, আমি ওয়ালটেয়ারে যাব। মা আমায় বলেন উল্কা। উল্কাই যদি হই, তাহলে শূন্যে আর ঘুরতে পারিনি! ধরায় যে মানুষ আমায় নিরন্তর টানছে, মুখ থুবড়ে তার দেশেই পড়বে নিবে। তবু ওই আমার মহান মৃত্যু! – কী বল মেজোবউ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? লুকিয়ে পালাতে হবে কিন্তু। অভিসারিকা সেজে, বুঝেছ?

রুবির চোখ যেন সোনার আংটিতে বসানো রুবির মতোই জ্বলতে লাগল।

মেজোবউ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলে উঠল, “আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে তোমার বহু আগেই সেখানে গিয়ে উঠতাম ভাই রুবি বিবি! দু মাস আগে এ-খবর পেলে কী করতাম জানি না? কিন্তু আজ আর আমাকে নিয়ে আমার কোনো ভয়-ডর নেই। খোকাকে যদি না হারাতাম, এই খোকাদের যদি না পেতাম, তাহলে আমি সব-আগে গিয়ে তাঁকে সেবা করে ধন্য হতাম।”

রুবি মেজোবউয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, উঠল, “অর্থাৎ তুমি রুবি হলে এতক্ষণ বেরিয়ে পড়তে।”

মেজোবউ হেসে ফেলে বললে, “হুঁ। তুই।”

রুবি এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বললে, “ভাই মেজোবউ, তুমি একটু আগে আমায় উদ্দেশ করেই বোধ হয় নমস্কার করেছিলে, আমার প্রতি-নমস্কার নাও। তুমিই আমায় পথ দেখালে।”

বলেই লতিফার দিকে চেয়ে বললে, “ভাই বুঁচি, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁদন ছিঁড়িতে হবে। আমার পথের সন্ধান পেয়েছি। ভাই মেজোবউ, আমি বুঁচির কাছে পাঠিয়ে দেব তোমার খোকাদের পাঠশালা তৈরির খরচা, গ্রহণ কোরো।”

মেজোবউ, লতিফা কিছু বলবার আগেই রুবির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "সোফার! গাড়ি লে আও!"

মৃত্যুক্ষুধা - ২৮

ভাই বুঁচি,

আমি যদি আজ আমার পরিচয় দিই-আমি তোদের সেই রুবি, তাহলে বিশ্বাস করবি? আমার বাপ মাও জানেন আর তোরাও হয়তো জানিস, আমি মরেছি! অথবা যদি না মরে থকি, তাহলে আমার মরণই মঙ্গল বা একমাত্র গতি!

তোরা – অন্তত তুই শুনে সুখী হবি, না দুঃখিত হবি জানিনে, যদি আমি লিখি যে, আমি আজও মরিনি। আমি বেঁচে গেছি বুঁচি, বেঁচে গেছি – তোদের চেয়েও বড়ো করে বেঁচে গেছি।

আজ তোকে সব কথা বলব খুলে, “তারপর সামনে রয়েছে কূলহারা সমুদ্র। কূলহারা জীবনকে আর কেউ নিতে না পারে, সে তো রয়েছে!

তোর কাছে যখন জানালাম, তোর আনু ভাই রেঙ্গুন জেল থেকে মৃত্যুর নোটিশ হাতে ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে, তখনই আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম। তোর-কাছে-লেখা তার চিঠির প্রতিটি অক্ষর যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল, “তোমায় চায়, সে তোমায় চায়!” রাজার লাঞ্ছনা-তিলক তার কপালে, শ্যাম সমান মরণের বাঁশি তার হাতে, ওই যে রাজপুত্র! আমি অভিসারে বেড়িয়ে পড়লাম।

আমি জানতাম, আমার বাপ-মার অদেশ-অনুরোধ ও স্নেহের বিপুল বাধাকে ডিঙিয়ে কিছুতেই বুঝি তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারব না। কিন্তু সে যখন তার মৃত্যু-মলিন চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকাল, তখন তার কাছে আমার সম্মুখের এত বড়ো বাধা যেন বাধা বলেই মনে হল না।

মনে হল এত বড়ো যে বাধা, এর বড়ো যে অন্তরায় – সে তার চেয়েও বড়ো, তার চেয়েও বিপুল! আকাশ ডাক দিল, আমার পাখা চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি নীড়ের মায়া ভুললাম।

যে পর্বতে জন্মগ্রহন করেছি আমি স্রোতস্বিনী, তার এত পাথর এত বন-জঙ্গল পথ আগলে আমায় ধরে রাখতে পারলে না, আমি সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটে এলাম। সমুদ্রের নাগাল পেয়েছি, আজ আমার মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ, এই আমার পরিণতি, এই আমার সার্থকতা। কূল হারিয়েছে অকূলের বন্ধুকে পেলাম।

আমার বাপ-মার মনে – তোদের মনে কত ব্যথা দিয়েছে জানি। তোরা পাহাড়ের মতো সংস্কারের পর সংস্কারের পাথর চড়িয়ে উঁচু হয়ে আছিস, তোরা হয়তো তাকেই বলিস মহিমা। কিন্তু ওই মহিমার অচলায়তনে নিশ্বাস রোধ করে বেঁচে থাকার মায়া অন্তত আমার ছিল না কোনোদিন। ও জীবন আমার নয়। নিজেকে হারিয়ে দেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়াই আমার জীবনের গতি। পথে চলে, ভুল করে, পথ হারিয়েই আমার মুক্তি। জানি, ও জীবন আমার কাছে যেমন সত্য, তোদের কাছে তেমনই মিথ্যা।

আমার সত্যকে আমি চেয়েছি এবং পেয়েওছি – এই আমার সান্ত্বনা!...

একদিন অন্ধকার রাত্রে – যখন তোরা, আত্মীয়-স্বজন সবাই ঘুমুচ্ছিলি, আমি বেড়িয়ে পড়লাম অন্ধকারের হাত ধরে। আলোর দেশে পৌঁছে দিয়ে আমার সাথি অন্ধকার চলে গেছে! আমি আলো পেয়েছি, বন্ধুকে পেয়েছি – আমাকে পেয়েছি।

তোর চেয়ে তো বড়ো আত্মীয় আনসারের কেউ নেই, কই, তুই তো এমন করে আসতে পারলিনে!

আমি কে তার? দু-দিনের পরিচয় – কৈশোরের স্বপ্ন! কিন্তু সে-স্বপ্নের নেশা আর আমার কাটল না। সেই স্বপ্নের পরিচয়কে সকলের মাঝে স্বীকার করার অবকাশ বিধাতা দিলেন না। আমাদের শুভদৃষ্টি হল সকলের অন্তরালে – মৃত্যু আর সমুদ্রকে

সাক্ষী করে। আমাদের বাসর সাজাচ্ছে মৃত্যু তার অন্ধকারের নীলপুরীতে! বাইরে কেবল কোলাহল, কেবল লজ্জা, ভালো করে চোখ চেয়ে বন্ধুকে দেখবার অবকাশ নেই। এইবার দেখব তাকে সেই বাসর-ঘরে চোখ পুরে প্রাণ পুরে। রবি-শশী-গ্রহ-তারার দল আমাদের বাসর-ঘরে আজ থেকেই আড়ি পাতছে।...

এখানে এসে একদিন কাগজের দেখলাম, আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। আমি কি বুঝি না, কেন তিনি অবসর গ্রহণ করলেন – শুধু চাকরিতে নয়, হয়তো বা জীবনেও! সব বুঝি, তবু এর আর কোনো চারা ছিল না!

মনে করলাম, ভালোই হল এ। যে ক্ষমা এ জীবন পাব না বাবার কাছে, সে ক্ষমা চেয়ে নেব এর পরের জীবনে। সেখানে সংস্কারের বন্ধন নেই, মহিমার উচ্চতা নেই, প্রেস্টিজের অভিমান নেই। মৃত্যুর বাসর-ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নেব, আমি জানি – সেদিন প্রাণ ভরে তিনি আশীর্বাদ করবেন!

আর মা? আজ যদি যাই তাঁর কোলে ফিরে, আজও তিনি ধুলো মুছে তেমনি করে বুকে তুলে নেবেন। কিন্তু মা তো বাবাকে ছাড়িয়ে নেই। যে ক্ষমা বাবা এ জীবনে করতে পারবেন না, বুক ফেটে গেলেও না, মা সে-ক্ষমার বাণী উচ্ছারণ করতে পারবেন না! তাঁরা রটিয়েছেন, মেয়ে মরে গেছে। সেইটেই সত্য হোক!

আমার জন্য যে মিথ্যা কবর খোদাই হয়েছিল, সে-শূন্য থাকবে না। আমি তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব – যত তাড়াতাড়ি পারি মরে তাঁদের সকল লজ্জার অন্ত করব।

অবশ্য আত্মহত্যা করে নয়! এ ভীরুতা আমার মনে কোনো দিনই নেই। থাকলে অনেক আগেই মরতে পারতাম –অন্তত সেইদিন, যেদিন আমার অমতে আমাকে বিয়ের ছুরিতে গলা রাখতে হয়েছে।

এ তো গেল আমার দুঃখের কাহিনি। এইবার আমার সুখের কথা শুনবি?

আমি যখন ওয়ালটেয়ারে এসে নামলাম, দেখি আনসারের রাজ-বন্ধু পুলিশের গুপ্তচর আমায় ছেয়ে ফেলেছে। আমার শাপে-বর হল! কত সন্ধান করে তবে হয়তো তাকে বের করতে হত। তাদের কাছেই সন্ধান পেলাম, অবশ্য আমার জিনিসপত্র সন্ধান করতে দেওয়ার বিনিময়ে।

তখনও সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসেনি। তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি ছোট ঘরে অলসভাবে হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে আছে।

আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিলাম জুতা খুলে। দেবতার ঘরে কি জুতা পরে ঢুকতে আছে?

দেখলাম, বেলাশেষের পুরবি রাগিণীর মতো তার চোখে-মুখে কান্না আর ক্লান্তি। বাতায়নপথে সন্ধ্যাতারার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সে নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাকে নমস্কার করলে। আমি অমনই ঘুরে ঢুকে বললাম, "আমি এসেছি।"

সে কী আনন্দ তার চোখে-মুখে ! সে 'রুবি'বলে ডেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।...

আচ্ছা বুঁচি, তুই ঘুমন্ত ক্ষুধাতুর অজগরের জাগরণ দেখছিস? শিউরে উঠিসনে। সব কথা ভালো করে শোন।

দুদিন না যেতেই বুঝলাম, ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কী বন-হরিণীর?

সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল। আমি কাঁদতে লাগলাম, আমার জন্য নয় – ওর জন্য। এ -সর্বগ্রাসী ক্ষধা যে শুধু আমার মৃত্যু নয় – এ যে ওরও মৃত্যু! ও যে মৃত্যু-জরজর, আমাকে গ্রাস করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা কি আজ আর ওর আছে?

আমি জানতাম এ-রোগের বড়ো শত্রু ওই প্রবৃত্তি! নইলে, যে আনসারের সংযম তপস্বীর চেয়েও কঠোর, তাকে এ মৃত্যু-ক্ষুধায় পেয়ে বসল কেন?

সে যখন বলল, "রুবি, চিরদিনই বিষ খেয়ে বড়ো হয়েছি, আজ মৃত্যুর ক্ষণে তুমি অমৃত পরিবেশন করো! আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হই।"

আমি আমার উপবাসীর ভিখারী কে ফেরাতে পারলাম না।

তবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওকে কি বাঁচাতে পারবেন বলে মনে হয়?"

ডাক্তার বলল, "ওঁর একধারের ফুসফুস খেয়ে ফেলেছে। আর এক ধারও আক্রমণ করেছে। ও রোগ এখন আমাদের চিকিৎসার শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে, এখন ওঁকে যদি বিধাতা বাঁচান!"

আমি ডাক্তার কে নমস্কার করে বললাম, "তাহলে আপনার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই ডাক্তার সাহেব। ও শান্তিতে মরুক!"

ডাক্তার চলে গেল। আমিও আমার কর্তব্য বেছে নিলাম।

আমি পরিপূর্ণরূপে তার ক্ষুধিত-মুখে আত্মসমর্পণ করলাম! যদি ও না-ই বাঁচে, তবে ওকে ক্ষুধা নিয়ে মরতে দেব না, দুদিন আগে মরবে এই তো; তাছাড়া এ মৃত্যু তো ওর একার নয়, ওর বুকের মৃত্যু-বীজানু আমাকেও তো আক্রমণ করবে!

সে কী তৃপ্তি, সে কী আনন্দ ওর! মরুপথের পথিক মরবার আগে যেন মরূদ্যানের ছায়া পেল!

ওর আনন্দ, ওর হাসি, ওর সুখ দেখে মনে হল, ও বুঝি বেঁচে গেল! বিষই বুঝই ওর বিষের ওষুধ হল!

কিন্তু – কিন্তু – বুঁচি! লতি! সই! আজ আমার ঘরের প্রদীপ নিবে আসছে! তার শিখা কাঁপছে! মরণের ঝড় আমার ঘরে ঢুকে মাতামাতি করছে। আমি আমার এইটুকু আঁচলের আড়াল দিয়ে ওকে বাঁচাই কী করে ভাই?

কে জানত, ওর ওই হাসি, ওই আনন্দ – নিভবার আগে শেষ জ্বলে ওঠা!

চিঠি লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এল! তারই শিয়রে বসে এই চিঠি লিখছি। আমাদের শিয়রের বাতি নিভে আসছে। সে একদৃষ্টে ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে আছে! কথা বন্ধ হয়ে গেছে কাল থেকেই। কাউকে আমি ডাকিনি। সেও ডাকেনি।

দুইজনে সারারাত সমুদ্র আর আকাশের তারা দেখেছি।

একবার শুধু অতিকষ্টে বলেছিল, "ওই তারার দেশে যাবে?"

আমি বললাম, 'যাব।'সে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললে, "তাহলে এসো, আমি তোমার আশায় দাঁড়িয়ে থাকব!"

তারপর আমায় চুমু খেল।

এক ঝলক রক্ত উঠে এল! তার বুকের রক্তে আমার মুখ-ঠোঁট রাঙা হয়ে গেল।

আশীর্বাদ করিস, এই রক্ত-লেখা যেন আর না মোছে!...

তোর কাছে যখন এই লিপি গিয়ে পৌঁছবে – ততক্ষণে আমার দীপ নিভে যাবে! আমার সুন্দর পৃথিবী – আমার চোখে মলিন হয়ে উঠেছে! আমার চোখের নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে!

আমি জানি, আমারও দিন শেষ হয়ে এল! আমিও বেলাশেষের পুরবির কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার মৃত্যু-বীজাণু নীড় রচনা করেছে! আমার যেটুকু জীবন

বাকি আছে তা খেতে তাদের আর বেশিদিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমিলন--নতুন জীবনে–নতুন তারায়–নতুন দেশে – নতুন প্রেমে!

তোদের সকলের জন্যে সে কেঁদেছে। কত বড়ো, কত বিপুল জীবন নিয়ে সে জন্মেছিল – আর কী দুঃখ নিয়েই না সে গেল! রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে সে এসেছিল – সে গেল ভিখারির মতো – নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বন্ধু –একা!

সে বলে গেছে, মৃত্যুর পর তার দেহ মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে। সমুদ্রকে সে ভালোবেসেছিল – বুঝি বা আমার চেয়েও। সাগরের মতো প্রাণ যার – তাকে সাগরের জলেই ভাসিয়ে দেব।

আর আমার সময় নেই! আমারও প্রদীপ নিবে এল বল।

–রুবি

99